# সাধন-প্রসঙ্গ

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়

# সাধন-প্রসঙ্গ

(ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত সাধন সম্বন্ধে একটু আলোচন)

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
নিবেদিত

প্রকাশক:
ইউ, রায় এণ্ড সন্স্
১০০ গড়পার রোড
কলিকাত

প্রথম সংস্করণ          মূল্য ০ আন

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হইবে

Printed by
KARTIKCHANDRA BOSE
for
U RAY & SONS PRINTERS
100 Gurpar Road Calcutta

# নিবেদন

"ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না,
কব সাধন পূর্ণ হবে মনস্কামনা।"

সাধনের মহিমা ও প্রয়োজনীয়তা যখন এতদ্রূপ, তখন সাধনের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত কারণ, সে সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান না থাকিলে, সাধনে সাফল্য লাভের সম্ভাবনাই থাকে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীনতা ও উদারতার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এজন্য ইহার সাধন-পদ্ধতি যে নিত্য একরূপই থাকিবে, এমন নহে জগতের ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ সাধনের যে যে পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া সাধনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, ব্রাহ্মসাধককে অনুসন্ধিৎসু হইয়া সে সকলেরও জ্ঞানলাভ করিতে হইবে এবং সাধন সম্বন্ধে যাহা কল্যাণকর তাহার অনুসরণ সর্ব্বদাই করিতে হইবে

ব্রাহ্মসাধকের এই ভাবের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে যে সাধনপদ্ধতি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে ক্রমবিকাশের লক্ষণ পরিব্যক্ত হইতেছে এবং চিরদিন এই সাধনপদ্ধতি

বিকশিত ও উন্নত হইতে থাকিবে। এই ক্রমবিকাশশীল সাধন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করাই এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। সাধনে অনগ্রসর ব্যক্তির এ প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের সম্ভাবনা বেশী নাই। তাহা হইলেও আমাদিগকে সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। সফলতা লাভ সিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় প্রভুর প্রসাদেই হইয়া থাকে। তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিয়াই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্

অকিঞ্চন

# সাধন-প্রসঙ্গ

## জ্ঞান

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" "জ্ঞানাৎ পরতর নহি" উপরোক্ত বাক্য এবং এবংবিধ বহু বাক্য জ্ঞানের মহিমাব্যক্তির জন্য রচিত হইয়াছে ও হইতেছে জ্ঞানের এতাদৃশ ব ইহাপেক্ষাও অধিকতর মহিমাজ্ঞাপক বাক্য সকলের রচনার ও প্রচারের হেতু কি? জ্ঞান মানবকে এমন কি সম্পদ্ প্রদান করে, যে জন্য তাহার এতাদৃশ মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে বা হইয়া থাকে।

প্রকৃতরূপে অনুসন্ধিৎসুর চিত্ত লইয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, জ্ঞানের যে অতুল মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার প্রকৃত ভাব যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করিবার মত উপযুক্ত ভাষা নাই মানবীয় ভাষায় তাহা যথাযথভাবে পরিব্যক্ত হয় না। তাই নানারূপে নানা ভাষায় তাহার মহিমা ব্যক্ত করিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে

জ্ঞান মানবকে কি অতুল পরম সম্পদ্ দান করে, সে কথার উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয়—"জ্ঞানান্মুক্তি" জ্ঞান

হইতেই মানব মুক্তি প্রাপ্ত হয়। মুক্তির মত পরম সম্পদ্ মানবের অন্য কি আছে? মুক্তিই ত মানবের একান্ত প্রার্থনীয়, তাহাই মানবের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। সেই পরম প্রার্থনীয় সম্পদ্ যাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পরম লক্ষ্যে যাহাদ্বারা উপনীত হইতে সুযোগ পাওয়া যায়, তাহার তুল্য পরম পদার্থ আর কি আছে? তাহার মত পরম লভনীয়ই বা আর কি থাকিতে পারে বা আছে?

তৎপরে উপনিষদের ভাষায় বলিতে হয়—"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" জ্ঞানশুদ্ধি অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন। জ্ঞানপ্রসাদেই মানব বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিবার সুবিধা পাইয়া থাকেন। মানবের জন্য ব্রহ্মদর্শন বা তাঁহার উপলব্ধিই ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, তাহাই তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকারের সম্পদ্ ও শাশ্বতী শান্তিলাভের উপায়। সুতরাং যে জ্ঞান হইতে মানব এমন মহৎ সম্পদ লাভের সুযোগ পায়, তাহাই ত সর্ব্বতোভাবে পরমপদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য। এ জন্যই জ্ঞানের এরূপ মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে।

জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও তাহার প্রকৃত স্বরূপ লক্ষণ ইহাই যে, যাহাদ্বারা বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়, —তাহার প্রকৃত তথ্য জানা যায়, তাহাই জ্ঞান বস্তুর প্রকৃত পরিচয় যাহা হইতে পাওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান নামে অভিহিত হইবার যোগ্য বস্তু প্রধানতঃ পরমাত্মা, আত্ম ও জগৎ এই তিন ভাগে বিভক্ত এই তিনের অর্থাৎ পরমাত্মা, আত্ম ও জগতের যথাযথ পরিচয় যাহা হইতে পাওয়া যায়, তাহারই নাম জ্ঞান মানবকে এই তিন পদার্থ লইয়াই জীবন যাপন করিতে হয় তাহার জন্য পরমাত্মাই সর্ব্বোপরি অন্বেষণীয় তাঁহাকে জানা লাভ কর এবং তাঁহার হইয়া জীবনধারণ করাই তাহার পক্ষে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে একান্ত প্রার্থনীয় ও প্রয়োজনীয় তাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম এই কার্য্যেই নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক এই শুভ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া—তাহার সমস্ত শক্তি ইহাতে প্রযুক্ত হইলেই তাহার জীবনধারণ সার্থক ও আনন্দপ্রদ হয় তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে করণীয় শ্রেষ্ঠ কার্য্য

তৎপরে আত্মার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানাও তাহার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সে নিজে আত্মা—এই আত্মার প্রকৃতি কি, তাহার লক্ষ্য কি? তাহার উপার্জ্জনীয় কি?

কি ভাবে জীবন যাপন করিলে তাহার জীবনের যথার্থ ব্যবহার হয়, এবং কোন্ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তাহার বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক, তাহা অবগত হইয়া তদনুরূপ জীবন-যাপন করিতে প্রবৃত্ত থাকাই তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক সেই অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব যাহা হইতে পাওয়া যায়, তাহা যে তাহার পক্ষে কত মূল্যবান্ সম্পদ্, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে জ্ঞান যখন আত্মাকে এতাদৃশ সম্পদ্ দান করে, তখন জ্ঞানের মহিমা যে অতুলনীয় বলিয়া পরিকীর্তিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ?

জগৎ মানবের শিক্ষার জন্য মহাগ্রন্থরূপে অবস্থিতি করিতেছে এই জগৎ-রূপ মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াই—সে ইহলোকে যত দিন বাস করে তত দিন—সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ভোগের সহিত এবং কল্যাণলাভের সহিত বাস করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে ও পাইতে পারে আবার এই জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া এবং তাহার সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়াই সে পরলোকে—অনন্তকাল যে স্থানে বাস করিবে—সে স্থানে বাসের জন্য উপযুক্ত সম্বল সংগ্রহ করিতে সুযোগ পায় এবং এখানকার প্রকৃত শিক্ষালাভহইতেই তাহার প্রকৃত বিকাশের আরম্ভ হয় ও এখান হইতে

বিকাশের সুযোগ পাইলেই সেখানেও তাহার অধিকতর বিকশিত হইবার পক্ষে সুযোগ হয় জগদ্‌গ্রন্থকে উত্তমরূপে অধ্যয়নের সুবিধা যাহার হয়—সেই ত এই গ্রন্থে গ্রন্থ-কর্ত্তার অপার মহিমা, অপূর্ব্ব কৌশল ও অনন্ত শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাতে অনুরক্ত হইতে পারে জগদ্‌ গ্রন্থের অনুশীলন করিতে করিতেই মানব, সেই অনন্ত-লোক—যেখানে সে চিরকাল বাস করিবে, সেখানে বাসের উপযুক্তত লাভ করিতে সমর্থ হয় পার্থিব সম্পত্তি ও পারমার্থিক সম্পত্তি—এই উভয়বিধ সম্পত্তি লাভের সুযোগ, আত্মা এই জগদ্‌গ্রন্থের অধ্যয়ন হইতেই প্রাপ্ত হয় জ্ঞানই তাহাকে সে সুযোগ প্রদান করে—প্রকৃত জ্ঞানই চক্ষুস্বরূপ হইয়া—মানবকে জগদ্‌গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে সুতরাং জ্ঞান এদিক্ দিয়াও মানবের অক্ষয় মহৎ সম্পদ্—অতুল ঐশ্বর্য্য

জ্ঞান মানবকে যে অতুল সম্পদ্ দান করে, তাহার হেতুরূপে আরও বিশেষ ভাবে বলিতে হয় যে, জ্ঞানই মানবকে সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ অবস্থায় যাইবার সুযোগ প্রদান করে. জ্ঞানপ্রসাদেই আত্মা বিগতভী হইয়া থাকে, জ্ঞানের আগমনেই সে প্রকৃত সান্ত্বনা লাভ করে তাহাতেই সে সম্যক্ নিরুদ্বেগের অবস্থায় যাইয়া শাশ্বতী

শান্তি পাইয়া থাকে। কারণ, জ্ঞানই আত্মার মোহ দূর করিয়া তাহাকে তাহার প্রকৃত পরিচয় দেয়

আত্মা স্বভাবতঃই অতি নিরাপদ অবস্থাতেই বাস করে সে নিত্যই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের 'অব্যয়, অক্ষয় ও শাশ্বত আশ্রয়েই বাস করে। তত্ত্বদর্শী বিজ্ঞ উপদেষ্টাগণের সকলেই একবাক্যে ইহাই ব্যক্ত করিয়া ছেন যে, স্রষ্টা পাতা বিধাতা ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমাশ্রয় পরমেশ্বর হইতে কেহই ক্ষণকালের জন্যও দূরে অবস্থিতি করে না তাঁহার চিরন্তন আশ্রয়েই সকলকে সর্ব্বদা বাস করিতে হয় দূরত্ব বাহিরের অন্য অন্য পদার্থ হইতেই আছে বা থাকিতে পারে কিন্তু সেই ভূম মহান্ প্রভু হইতে কেহই দূরে নাই অজ্ঞানতা এবং মোহ প্রভাবেই সে দূরত্বের কল্পনা করে মোহ বশেই আত্মা সেই পরমাত্মা হইতে আপনাকে দূরে অবস্থিত মনে করিয়া একাকিত্বের বিষম বিপদ জাল রচনা করে এবং একাকী হইয়া বাসের যে অতি উদ্বেগপূর্ণ ভাবনা ও বিপদ্ তাহাকে রচনা করে সে অবস্থাতে সে কেবলই ভয় পায় এবং আপনাকে অসহায় ও নিরুপায় ভাবিয়া, অতি অশান্তির দারুণ যাতনা ভোগ করে তাহার ভয়ের কোন হেতু উপস্থিত না থাকিলেও, সে

কেবলই ভয় পায় এবং ভীত হইয়া সহ উদ্বেগেই কাল কাটাইতে বাধ্য হয়। ভয়ের কোন হেতু উপস্থিত নাই, অথচ ভীত হইয়া উদ্বেগের সহিত বাস করিতে বাধ্য হওয়া,—সে যে কি ভীষণ যাতনা—কি বিষম বিড়ম্বনা, এ দুঃখের যে বর্ণনা হয় না—পরিমাণ হয় না।

এই অকারণোদ্ভূত দুঃখ হইতে—দুর্গতি হইতে—জ্ঞানই মানবকে মুক্তি দান করে—রক্ষা করে। জ্ঞানই জানাইয়া দেয়, মানব, তুমি স্বভাবতঃ অসহায় নহ, নিরুপায়, নিরাশ্রয় নহ। তোমার দুঃখিত হইবার—উদ্বিগ্ন হইয়া, ভীত হইয়া, কাল কাটাইবার কোন বাস্তবিক হেতু নাই, তুমি তোমার প্রকৃত পরিচয় না পাইয়াই, উদ্বিগ্ন হইতেছ—ভীত হইতেছ। নিজের অবস্থার যথার্থ পরিচয় পাইলেই তুমি জানিবে, তুমি পরমপিতা পরমমাতার অভয়-ক্রোড়েই নিত্য বাস করিতেছ। যিনি বিশ্বম্ভর, তিনিই তোমার সকল ভার বহন করিতেছেন। যিনি পরমসঙ্গী পরম সহায়, তুমি নিয়ত তাঁহারি সঙ্গে, তাঁহার আশ্রয়েই রহিয়াছ। তাঁহার সহিত কোন প্রকারেই—কোন কালেই তোমার বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমার অভয় ভীত হইবার—উদ্বিগ্ন হইবার কোন হেতুই উপস্থিত নাই। প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে, আত্মার দৃষ্টিশক্তি খুলিয়া গেলে,

মানব দেখিতে পায়—তাহার নিয়ত সঙ্গী ও সহায় এবং নিয়ত রক্ষক তাহার সঙ্গেই আছেন, তাহার অন্তরতর অন্তরতম হইয়াই আছেন, তাহার সর্ব্বসন্তাপহারী প্রভুকে জ্ঞান প্রসাদে এরূপে জানিয়াই সে কৃতার্থ হয়—সেই মুহূর্ত্তেই সে সকল প্রকারের ভয় হইতে অভয়-ধামে উপস্থিত হয়—তাহার সর্ব্বপ্রকারের উদ্বেগের অভাব হয়।

বাহিরের একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এ কথাটি সহজে বোধগম্য হইতে পারে ঘটনাক্রমে যদি কোন মানব অতি শৈশবেই তাহার অতি ধনী পিতা মাতার আশ্রয় হইতে দূরে নীত হয়, সে যদি জানিতে না পারে যে; সে ধনীর সন্তান, তবে তাহাকে অপরাপর সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে সামান্য ভাবেই কাল কাটাইতে হয় অপর দশজন বালক যে ভাবে হীনতার মধ্যে সময় যাপন করিয়া থাকে, তাহাকেও সেইরূপ হীনতার মধ্যেই হীনাবস্থাতেই পরিবর্দ্ধিত হইতে হয় কিন্তু যখন শুভ মুহূর্ত্তে সে তাহার আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই মুহূর্ত্তেই তাহাতে অতি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে সে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ধনীর যেরূপ গতি, মতি সবই প্রাপ্ত হয় তাহার আচার ব্যবহারে তখনই সমূহ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সে আর দরিদ্রের সামান্য বেশ ধারণ করিয়া থাকে না।

সকল দিক দিয়াই তাহাতে পরিবর্ত্তনসকল সমাগত হইয়া থাকে জ্ঞানই তাহাকে এই পরিবর্ত্তনে লইয়া যায় প্রকৃত ভাবে আত্মপরিচয় পাইয়াই সে আপনাকে ধনীর সন্তানরূপে জানিয়, ধনীর যে সান্ত্বন-পূর্ণ অবস্থা সেই অবস্থায় সে উপনীত হয়

আর একটি দৃষ্টান্তও এ ভাবের সমর্থনজন্য উপস্থিত করা যাইতে পারে কোন পথিক এক গৃহস্থের গৃহে অতিথি হইয়া রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সদাশয় গৃহস্থ অতিথির জন্য রাত্রিতে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় হইবে, তাহার সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু পথিককে বলিতে ভুল হইয়াছিল যে তাহার নিকটেই প্রদীপ জ্বালাইবার আয়োজন রহিয়াছে এই ভ্রান্তি-হইতে পথিককে অতি অসুবিধার মধ্যেই পড়িতে হইল মধ্য রাত্রিতে জাগরিত হইয়া, পথিক অন্ধকারে কিছুই জানিতে পারিলেন ন যে তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু সকল কোথায় আছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া তিনি গৃহের বাহিরেও গমন করিতে পারিলেন ন তাঁহাকে সে রাত্রি অতি অসুবিধার মধ্যেই যাপন করিতে হইল কিন্তু রাত্রির অবসানে—সূর্য্যালোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর, তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই তাঁহার

নিকটেই ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াই তিনি তাহ জানিতে পারেন নাই এবং তাহাতেই তিনি অতি অসুবিধার মধ্যে কষ্টে কাল কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আলোক পাইয়া সকলই পাইলেন সকল অসুবিধাই তাঁহার চলিয়া গেল গৃহস্থের প্রতি তাঁহার অন্তরে যে বিরক্তি জন্মিয়াছিল, সেই মুহূর্তেই তাহাও চলিয়া গেল জ্ঞান পাইয়াই তাহার অসুবিধাও গেল এবং মনের অশান্তিও চলিয় গেল

তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান মানবের কেমন পরম সুহৃদ্ জ্ঞানই তাহাকে তাহার পরম প্রিয় যিনি, তাঁহার সহিত পরিচিত করে মানবের পক্ষে যাহা একান্ত তৃপ্তির হেতু, যাহ তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা মিষ্ট ও উপাদেয়, যাহ তাহার জন্য অতীব কল্যাণকর—জ্ঞান প্রসাদেই সে তাহাকে জানিতে পারে যে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিয় আপনাকে অসহায় ও একাকী জানিয়া দীনতায় মগ্ন ছিল ; যে প্রাণারামকে নিকটে না দেখিয়া তপ্ত হইতেছিল জুড়াইবার মত কিছু ন পাইয় সন্তপ্ত হইতেছিল—চিরশান্তির উৎস হইতে আপনাকে দূরে মনে করিয়া কেবলই উদ্বেগ ভোগ করিতেছিল —জ্ঞানই তাহাকে এই মহৎ-ভয় হইতে রক্ষ করে—

জ্ঞানই তাহাকে তাহার চির-আশ্রয়ের—চির সান্ত্বনার মূল যিনি, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে। জ্ঞানই তাহার চিরন্তন মহৎ আশ্রয়ের সহিত যুক্ত হইবার পথ বলিয়া দেয়। এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—জ্ঞানই তাহাকে সর্ব্ববিধ দুঃখ ও দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি দেয়, শান্তির সুস্নিগ্ধ নিরাপদ অবস্থায় লইয়া যায়। জ্ঞানই তাহাকে ভূমা পরমেশ্বরের সন্ধান জানাইয়া—তাহাকে ভূমানন্দভোগের সুযোগ দান করে। জ্ঞানই তাহার জন্য মহৎ স্বাস্থ্যলাভের উপায় বলিয়া দিয়া, তাহাকে শাশ্বত আনন্দভোগের সুযোগ প্রদান করে এবং জ্ঞানই তাহাকে নিত্য স্বাস্থ্যপ্রদ অবস্থায় লইয়া যাইবার পথে সহায় হয়। তাই জ্ঞানের এত মহিমা। যাহা মানবের চিরসম্পদ, ভূমানন্দরূপে বর্ত্তমান, মোহজনিত অজ্ঞানতাই তাহা হইতে তাহাকে দূরে লইয়া যায়—এবং মহৎ সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে। যাহা তাহার নিত্য সহচর ও সম্বল হইয়া আছে, তাহার পরিচয় না পাইয়াই, সে একান্ত দুঃখী দুর্ব্বল ও পরিতপ্ত হইয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। জ্ঞানই তাহার এবম্প্রকারের মহৎ অনর্থ হইতে তাহাকে রক্ষা করে, তাহাকে তাহার সকল সম্পদের তত্ত্ব জানায়, তাই জ্ঞানের এরূপ অতুল মহিমার বার্ত্তা পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানান্মুক্তি—জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হয় এই বাক্যের সার্থকতা কি? তাহাও অনুসন্ধানরত চিত্তের নিকটে প্রতিভাত হইয়া থাকে জ্ঞান হইতে কিরূপে মুক্তি পাওয়া যায়? জানিলে জ্ঞাতাতে এমন কি পরিবর্তন ঘটে, যে জন্য সে মুক্তিলাভের সুযোগ পায়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, মানবকে যখনই কিছু জানিতে হয়, তখনই তাহাকে সেই জ্ঞাতব্যের মত হইয়াই, তাহাকে জানিতে হয় প্রেমিককে জানিতে হইলে প্রেমিক হইয়াই জানিতে হয় অপ্রেমিকের প্রেমিককে জানিবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্বান্, পণ্ডিতকে জানিতে হইলে বিদ্বান্, পণ্ডিত হইয়াই জানিতে হয় অপণ্ডিত পণ্ডিতকে একটা সম্রমের দৃষ্টিতে দেখিতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে জানিতে পারে না সাধুকে সাধুগণই জানেন, অসাধু ব্যক্তি বাস্তবিকরূপে সাধুকে জানিতে পারে না। সর্ব্বত্রই ইহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে জানিতে হইলেই কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞেয়ের মত হইয়াই তাহাকে জানিতে হয় দুর্ব্বল বলবানকে জানে না, অসুস্থ সুস্থকে জানে না, অকবি কবিকে জানে না, সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে

পরমেশ্বরকে জানিতে হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার মত হইয়া, তাঁহার ভাবাপন্ন হইয়াই তাঁহাকে

জানিতে হয় জ্ঞানই যে তাঁহাকে জানিবার সুযোগ দেয়, এই কথার অর্থও এই যে, জ্ঞানপ্রসাদে কিয়ৎপরিমাণে সেই পরম জ্ঞেয়ের মত হইয়াই তাঁহাকে জানা যায় জ্ঞানলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরম জ্ঞেয়ের ভাবাপন্ন হইতে হয় জ্ঞানীকে যখন জ্ঞেয়ের মতন হইয়াই, জ্ঞান লাভ করিতে হয়—জ্ঞানবান হইতে হয়, তখন সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেন জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হয় আত্মাকে পরমাত্মার ভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ শুদ্ধস্বভাব হইয়া, প্রেমবান হইয়াই এবং পরমাত্মার অন্যান্য পরম ঐশ্বর্য্যের আস্বাদন পাইয়া—তত্তৎ ভাবাপন্ন হইয়াই ত তাহাকে মুক্ত হইতে হয় মুক্তির অবস্থায় যাইতে হইলেই আত্মাকে পরমেশ্বরের স্বরূপের অনুরূপ হইয়াই যাইতে হয়, পরমেশ্বরের ভাবাপন্ন হইলেই সে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তাহাতেই তাহার জীবনের সার্থকতা তাহা হইলেই— "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি" বাক্যের সার্থকতা হয় জ্ঞান হইতেই আত্মার এই পরম প্রার্থনীয় অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় এ জন্যই "জ্ঞানান্মুক্তি" বাক্য সমর্থ-যুক্ত হইয়াছে।

---

# ভক্তি

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" পরমেশ্বরে যে পর অনুরক্তি তাহারই নাম ভক্তি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে ভক্তির এত মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, ভক্তির উক্ত লক্ষণ দ্বারাই তাহা জানা যাইতেছে। মানবের জন্য অতি প্রার্থনীয় অবস্থা কি? তদুত্তরে সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, পরমেশ্বরকে জানা এবং তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত হওয়া, ইহাই মানবের জন্য পরম প্রার্থনীয় অবস্থা। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের মুখে পুরাণকার এই প্রার্থনাই ব্যক্ত করিয়াছেন—"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু" অবিবেকী লোকদিগের বিষয়ে যেরূপ প্রীতি হইয়া থাকে, হে ভগবন্, তোমার প্রতি আমার সে প্রকার প্রীতি হউক।

বিষয়ী লোকের বিষয়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও প্রার্থনীয় হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহার তৃপ্তি। বিষয়ী লোকে বিষয়কে যেরূপ প্রার্থনীয় বলিয়া জানে, ভক্ত, ঈশ্বরপ্রীতিকে তদ্রূপ প্রার্থনীয় বলিয়া জানিয়া ভগবানের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। ইহাদ্বারাই ভক্তের প্রাণের কথা পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, তিনি ভক্তিকে কত পরিমাণে

মূল্যবান জ্ঞান করেন ঈশ্বরে পরানুরাগ মানবের জন্য পরম পদার্থ তাহা পাইবার জন্যই সাধক আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকেন

ভক্তি বা প্রেমের আর একটি লক্ষণ এই— 'অনন্য-মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ অন্য কোন বিষয়ে মমতা না রাখিয়া একমাত্র বিষ্ণুতে (ঈশ্বরে) যে প্রেমযুক্ত মমতা, তাহাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ ভক্তি বলিয়াছেন ভক্তি বা ভাবের অন্য একটি লক্ষণ এই—

"মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতি-রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যহ্যদাহৃতম্ অহৈতুক্যব্যবহিতা যাঃ ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে" ঈশ্বরোক্তিরূপে কথাটি উক্ত হইয়াছে—মদীয় গুণ শ্রবণ মাত্র সর্ব্বান্তর্যামী ও পুরুষোত্তম আমাতে সমুদ্র-গামী গঙ্গাজলের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন অহৈতুকী, অব্যবহিত মনোগতিরূপ যে ভক্তির সঞ্চার হয় তাহাই নির্গুণ ভক্তি-যোগের লক্ষণ।

ভক্তির এতদ্রূপ লক্ষণদ্বারা জানা যাইতেছে—মানবের জন্য ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় অবস্থা—যে অবস্থায়

ঈশ্বরের গুণ শ্রবণমাত্র চিত্তের গতি গঙ্গাজলের নিয়ত প্রবাহমান স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের দিকে হইতে থাকে, তাহাপেক্ষ মানবের জন্য উচ্চ অবস্থা আর কি হইতে পারে? মানব পৃথিবীর জীব হইয়াও যদি অপার্থিব সম্পদের অধিকারী হইতে পারে, পরম সুন্দর—পরমানন্দময় পরমেশ্বরের দিকেই যদি তাহার চিত্তের অবিচ্ছিন্ন অব্যবহিত গতি হয়, তবে সে এখানে থাকিয়াই স্বর্গের জীব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এরূপ নিরতিশয় অনুরাগ—একান্ত মমত্ব পরমেশ্বরে হইলে সাধকের জন্য আর কি প্রার্থনীয় থাকে? ভক্তের লক্ষণ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদ্বারাও জানা যায় ভক্তির সমাগমে সাধক কি শোভন অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকেন ভক্তের একটি লক্ষণ এই—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা
আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচি"

ভক্ত ক্ষমাশীল এবং নিয়ত কর্ম্মশীল হইবেন, তাঁহার পার্থিববিষয়ে বিরক্তি থাকিবে এবং তিনি মানশূন্য হইবেন নিয়ত আশাযুক্ত হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত অর্থাৎ প্রিয়তম পরমেশ্বরের জন্য উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া থাকিবেন এবং তাঁহার সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম গানে রুচি থাকিবে।

পার্থিব জীবের পক্ষে ইহাপেক্ষা প্রার্থনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

মুক্তিই জীবাত্মার জন্য পরম প্রার্থনীয়। কিন্তু ভক্তি পথের পথিকগণ মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিকেই অধিক প্রার্থনীয় বলিয়া জানেন। তাঁহারা মুক্তিকে ভক্তির দাসীরূপে গণনা করেন। অর্থাৎ ভক্তির সমাগম হইলে মুক্তি ত হইবেই। এ দেশে মুক্তির সাধারণ লক্ষণ যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা মুক্ত জীবাত্মার সকল প্রকার অগ্রগতিই অসম্ভব হয়—তাহার আর কিছুই করিবার থাকে না—পাইবার বা ভোগ করিবার থাকে না। মুক্ত আত্মা নিশ্চল হইয়াই বাস করে। ভক্ত কিন্তু ভক্তি পাইয়া, ভক্তবৎসলের সহবাস-জনিত ভূমানন্দ ভোগ করিবার জন্য সমুৎসুক হয়েন এবং তাঁহার সেবা ও মহিমা কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ অবস্থা ও প্রার্থনীয় বলিয়া জানেন। তাই মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিই ভক্তের অধিক বাঞ্ছনীয়। ভগবদ্‌গীতাকার জ্ঞানী—ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গীতায় উক্ত হইয়াছে—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি শ্রেণীর সুকৃত ব্যক্তিরাই পরমেশ্বরের ভজনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ ও ভক্ত হইয়া থাকেন, সেই জ্ঞানী ভক্তই ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়।

গীতার উক্তি এইরূপ—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।"

উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠ ও মদ্ভক্ত হইয়া থাকেন এবং আমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয় হন । অতএব পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যক্তির মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ।

গীতাকার ভক্তকেই ভগবানের অতীব প্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । গীতায় উক্ত হইয়াছে "মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ······ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ । যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে । শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ।" যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে, এইরূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়।··· যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ও মৎপরায়ণ হইয়া যথোক্ত ধর্ম্মরূপ অমৃতের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্ত আমার অতীব প্রিয় । গীতাকার ঈশ্বরকে সকলের পক্ষেই সমান বলিয়া বর্ণন করিয়াও, ভক্তকেই যখন ঈশ্বরের অতীব প্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তখন গীতাকারের মতে ভক্তই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহা বুঝা যাইতেছে । ভক্তের এই

শ্রেষ্ঠত্ব ভক্তিলাভ হইতেই হইয়া থাকে   সুতরাং ভক্তি সাধকের জন্য পরম পদার্থ  ভক্ত ঈশ্বরের অতিশয় অনুরক্ত হইয়া থাকেন, তাই পরমেশ্বরও ভক্তকে প্রিয়রূপে বরণ করেন

ভক্তের এই উচ্চ অধিকার—এই মহ সম্পদ্ ত ভক্তি হইতেই সমাগত হয়  ভক্তিই ভক্তকে ঈশ্বরে একান্ত অনুরক্ত করিয়, তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া বাসের সুযোগ প্রদান করে  পরমেশ্বরের স্মরণ, মনন ও সেবাদিতে নিযুক্ত থাকিবার সুযোগও ভক্তি হইতেই ভক্ত পাইয়া থাকেন  সুতরাং ভক্তিই সাধকের সহিত পরমেশ্বরের যোগস্থাপনে প্রধান সহায়  ভক্তির আতিশয্য হইলে ভক্ত আর ঈশ্বর হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিযুক্ত হইয় থাকিতে চাহেন না  ঈশ্বরের সহিত বিচ্ছেদ ও বিরহ, ভক্তের পক্ষে অতি যাতনাদায়ক হয়, এজন্য তিনি কোনও ক্রমেই যাহাতে ঈশ্বরের সহিত বিচ্ছেদ আসিতে পারে, এমন কিছুতেই রত হইতে চাহেন না বা পারেন না  ক্ষণ-কালের বিচ্ছেদযাতনাও তখন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয় থাকে  তখন তিনি বলিয়া থাকেন, "আর চলে না, চলে না, চলে না জননী, তোমা বিনা দিন চলে না " আরও বলেন, "সহে না যাতনা আর, মা, আমায় বাঁচাও বাঁচাও "

এই অবস্থা পাইয়া ভক্ত ধন্য হইয়া যান। ভক্তি প্রসাদেই সাধক পরমেশ্বরের সহিত নিত্য অবিচ্ছিন্ন যোগযুক্ত হইয়া বাস করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। এই নিত্য-যোগের অবস্থা হইতে সাধকের জন্য প্রার্থনীয়ই বা কি আছে, পরম সম্পদই বা কি আছে? যাহা পাইয়া মানব, তাহাপেক্ষা অন্য কিছুকে অধিক প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিতে পারেন না, সেই পরম লভনীয় অবস্থা ভক্তি হইতেই সমাগত হয়। সুতরাং ভক্তিই সাধকের জন্য পরম পদার্থ।

ভক্তিসমাগমে সাধকের রুচি সাধু হয়, জীবে অপার্থিব উদার প্রেমের উদয় হয়। ভক্তিসমাগমেই সাধকে শুদ্ধ প্রীতি ও সাধুভাব সমাগম হয় এবং সেবায় ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের বিমলানন্দ ভোগের সুযোগ উপস্থিত হয়। তাই ভক্তির এত মহিমা। যাহা পাইলে ঈশ্বরও সাধককে প্রিয় বলিয়া আপন করেন, তাহাপেক্ষা মহৎ সম্পদ্ মানবের আর কি আছে?

আমাদের একটি নগর সংকীর্ত্তনে উক্ত হইয়াছে—

(ও ভাই) জানিও ভকতি—সুদুর্লভ অতি, বহু ভাগ্যে তাহা হয় রে, দীনের দীন হয়ে আপনা বিকায়ে পুণ্যবানে তাহা লয় রে (এই ভক্তিধন) (এ ধন সহজে মিলে না,

দেবের বাঞ্ছিত এ ধন ) . নামে যাঁর রতি— জীবে যাঁর প্রীতি, প্রেমে প্রেমে প্রায় লয় রে ( যে জন জীবে প্রেম বিতরে ) তাঁরে ভক্তি দানে, তোষেন পরাণে ( সেই ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু ) ভক্তিদাতা প্রেমময় রে (নব জীবন দিয়ে)

আমাদের একটি সংগীতেও আছে—'তব নামে কত মাধুরী, যেই ভকত সেই জানে, আর তুমি জানাও যারে সেই জানে " ঈশ্বরের নাম সকলের পক্ষেই মধুর হইলেও ভক্তের প্রাণে ভক্তিসমাগমে তাহ অতীব মধুররূপে অনুভূত হইয় থাকে অতএব ভক্তিই সাধকের পরম সম্পদ লাভের উপায় ভক্তিই সাধককে পরমোচ্চ অধিকার প্রদান করিয় থাকে

# কর্ম্ম

জগতে কর্ম্মহীন কেহই নহে পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, কেহই কর্ম্মহীন হইয়া সময় যাপন করে না বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই কর্ম্মী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় যে স্থানেই জীবন স্রোত প্রবাহিত, সে স্থানেই কর্ম্মস্রোতও প্রবাহিত রহিয়াছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক সকলকেই কর্ম্ম করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হইতেছে। এজন্য সহজ বুদ্ধিরও মীমাংসা এই যে, কর্ম্মহীন হইলে কাহারও চলে না গীতাকার এই তত্ত্বের অর্থসঙ্গত করিয়াই বলিয়াছেন—"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ কর্ম্মণঃ" অর্থাৎ কর্ম্মে নিবৃত্ত হইলে তোমার শরীর নির্ব্বাহই হইবে না সুতরাং যাহা প্রত্যেক প্রাণীরই একান্ত করণীয়, তাহা কখনই সামান্য বা উপেক্ষণীয় নহে কর্ম্মকে কাহারও অবহেলা করিয়া চলা উচিত নহে

কর্ম্ম একান্ত করণীয় হইলেও,—প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য হইলেও কি কর্ম্ম আর কি অকর্ম্ম, সে বিষয়ে জনসমাজে বিস্তর মতভেদ আছে দেশ বিদেশে যাহা কর্ম্ম বা সুকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, তাহাই হয়ত অন্য দেশে অকর্ম্ম বা নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া

পবিগণিত গীতাকাব সাধুকার্য্যের লক্ষণনির্দ্দেশ নিম্নলিখিতরূপে কবিয়াছেন—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥"

অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনার্থক ভিন্ন কর্ম্ম মাত্রই লোকের বন্ধনের কারণ হয়। অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মাচরণ কর। গীতায় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্মপরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥"

অর্থাৎ, তুমি সতত ফলাসক্তিশূন্য হইয়া অবশ্য বিধেয়কর্ম্মের আচরণ কর। কেন না, পুরুষ ফলাসক্তিরহিত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিলে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে।

গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।"

হে ধনঞ্জয়! তুমি যোগস্থ হইয়া আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম কর।

গীতার এ সকল উক্তিদ্বারা অনুভব করা যাইতেছে, গীতাকারের মতে, সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম, সাধুকর্ম্ম হয়। তাহা হইলে আর কর্ম্মজনিত বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। কিন্তু শুধু

নিষ্কাম হইয়া—আসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলেই যে সে কর্ম্ম সাধুকর্ম্ম হইবে, এরূপ সিদ্ধান্তকেও সম্পূর্ণরূপে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। নিষ্কাম হইয়া, সম্যক্‌রূপে আসক্তি বিবর্হিত হইয়া কর্ম্ম করিলেও তাহা সাধুকর্ম্ম না হইতে পারে। লোকে ফলকামনাশূন্য হইয়া জয়াজয় বাসনাবিবর্হিত হইয়াও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ কখনই সাধুকার্য্য নহে। যুদ্ধ সর্ব্বাবস্থাতেই নিন্দনীয় সর্ব্বাবস্থাতেই যুদ্ধ অনিষ্ট ফলই প্রদান করে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মানব সর্ব্বপ্রকারের পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। যুদ্ধ কখনই কল্যাণপ্রদ হয় না। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা যেরূপ ভাবেই বর্ণিত হউক না কেন, যুদ্ধ হিংসাত্মক কর্ম্ম হিংসা কখনই প্রশংসনীয় নহে।

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।"

* * * *

"ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ।"

ইহাই অত্যুত্তম আদর্শ, ইহাই অত্যুত্তম সাধুতাব্যঞ্জক বাণী। সর্ব্বাবস্থাতে সকলের জন্যই ইহা অতি কল্যাণকর ও ধর্ম্মসম্মত বাণী। ক্রোধহীনতাদ্বারাই ক্রোধকে জয় করিতে হইবে। সাধুতাদ্বারাই অসাধুতাকে পরাজয় করিতে হইবে। পাপকারীর পাপাচরণের প্রতিশোধ

লইবার জন্য পাপ করিতে হইবে না। সর্ব্বদা সাধুতাতেই বাস করিতে হইবে। ইহাই সাধুজনের অবলম্বিত পথ। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা" প্রভৃতি মহাবাক্য এবং ঈশা ও বুদ্ধ প্রভৃতি মহাজনগণের প্রদর্শিত উদার প্রেমের আদর্শ—যাহা সকল কালেই প্রশংসনীয় ও অবলম্বনীয়, সে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়, যদি পাপের প্রতি পাপাচরণ করিতে হয়, যদি আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করিতে হয়। যুদ্ধে ত আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করিতেই হয়। পাপের প্রতি পাপাচরণ করিতেই হয়। সুতরাং সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এবং নিষ্কাম হইয়া, জয়াজয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই যে তাহা উত্তম সাধুকার্য্য হইবে, এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

তবে সাধুকার্য্যের—শুদ্ধ কর্ম্মের লক্ষণ কি? সাধুকার্য্য—যাহা মানবকে পবিত্রচিত্ত করে, পরিত্রাণ লাভের সুযোগ প্রদান করে, সেই সুকর্ম্মের লক্ষণ কি হওয়া উচিত? এ বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমাদের নিকটে অতি মহৎ—অতি সুন্দর তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। সে তত্ত্ব সহজেই সকলের বোধগম্য হইবার যোগ্য। অতি সহজে—অল্প কথাতেই তাহা ব্যক্ত হইতে পারে, সে কথাটি

সংক্ষেপে এই—"তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা অর্থাৎ যাহা ঈশ্বরের প্রিয়—যাহা তাঁহার অনুমোদিত তাহাই অনিন্দ্য সুন্দর এবং সাধুকার্য্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, কারণ, তাহাই তাঁহার উপাসন। ঈশ্বরোপাসনাই সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সুন্দর ও উত্তম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য রূপ যে উপাসন তাহাই মানবের মুক্তির হেতু তাহা মানবকে মোহাভিভূত করে না—বন্ধনে আবদ্ধ করে না সুতরাং তাহাই সর্ব্বতোভাবে সুন্দর ও সাধু কার্য্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য

প্রশ্ন হইতে পারে ঈশ্বরানুমোদিত ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের লক্ষণ কি? কোন্ চিহ্নদ্বারা তাহা বুঝা যাইবে যে, এই কর্ম্ম ঈশ্বরানুমোদিত বা তাঁহার অননুমোদিত কোন্ লক্ষণদ্বারা বুঝা যাইবে, ইহা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বা অপ্রিয়কার্য্য

কার্য্যটি ঈশ্বরের অনুমোদিত কি না বা প্রিয়কার্য্য কি না, তাহা অনুধাবন করিতে বা উপযুক্ত ভাবে সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যে বেশী বিদ্যা বা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির আবশ্যক হয়, এমন নহে তাহা সহজ ও সরল বুদ্ধির

নিকটে সহজেই প্রতিভাত হইয় থাকে এ স্থলেই সঙ্গত্যাগী হইতে হয়—নিষ্কাম হইয়া বিচাব করিতে হয়। আসক্তি ত্যাগের ইহাই প্রকৃষ্ট স্থল কামনাযুক্ত মনে বা লাভ ক্ষতিগণনাব অধীন মনে—কর্ম্মটি প্রকৃত ঐশ্বরিক কি ন, ঈশ্বরানুমোদিত কি ন, সে সিদ্ধান্ত সমুপস্থিত হয় ন সে সিদ্ধান্ত প্রকৃতরূপে সাংসারিক ক্ষতিবৃদ্ধি-গণনাশূন্য সবল ও সহজ বুদ্ধিব নিকটে আপনা হইতেই প্রতিভাত হয় এ প্রশ্নেব উত্তব পাইবাব জন্য, বেশী বিদ্যা ব পাণ্ডিত্যেব প্রয়োজন হয় ন অধিক বিচার বিতর্কেরও প্রয়োজন হয় না এ জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরেব প্রীতি এবং তাঁহাব প্রিয়কার্য্যকেই জীবনের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য বলিয়া, ঈশ্বরেব উপাসনা বলিয় নির্দ্দেশ কবিয়াছেন শুভক্ষণে মঙ্গলময় প্রভুর শুভ প্রেবণাতেই, এই মহাতত্ব জগতে অভিব্যক্ত হইয়াছে ইহাই সমুজ্জল—ইহাই সমুন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান সম্মত ইহাই সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মানবের জন্য পবমসম্পদ্, অতি মহৎ আদর্শ ইহার অনুসরণেই মানব ধন্য হইবে, পরম শান্তি—শাশ্বতী শান্তি ও পরমা-গতি লাভ করিয় কৃতার্থ হইবে

উক্ত প্রকারের কর্ম্মপ্রবৃত্তি মানবে অতি সহজে—অতি স্বাভাবিক ভাবেই সমুপস্থিত হইয় থাকে মানুষ যদি

জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতে পারে এবং সে যদি মহান্ প্রভুর অতুল দান রূপে ভক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাতে সেই মহান্ প্রভুর প্রিয় অনুষ্ঠান রূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তি আপনাহইতেই সমাগত হইবে যে পরমেশ্বরে ভক্তিমান্ হইবে, সে তাঁহার প্রিয় অনুষ্ঠান না করিয়াই পারিবে না ঈশ্বরের ভক্ত হইবে অথচ তাঁহার প্রিয় অনুষ্ঠান করিবে না ইহা হইতেই পারে না ভক্তির সমাগম হইবে আর ঈশ্বরের প্রিয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসিবে না, ইহ অর্থহীন ব্যাপার যদি দেখা যায়, ভক্তির বাহ্য লক্ষণ সকল ব্যক্ত হইতেছে আর সে ব্যক্তিতে প্রিয়তম পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনের জন্য ব্যগ্রতা বা উদ্যম আসিতেছে না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে ভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে তাহাতে কাল্পনিক কিছু আছে তাহাতে মানবীয় রচনা কিছু আছে ভক্ত বা ভাবুকের সম্বন্ধে "অব্যর্থকালত্বং" বাক্য সর্ব্বদাই প্রযোজ্য ভক্ত কখনও বৃথায় সময় যাপন করেন না তাঁহার মনপ্রাণ যেমন পরম প্রভুর স্মরণ, মনন ও নামগানে অতি উৎসুক ও তাহাতেই রত—তাহাতেই তাহার সদা রুচি, তেমনি তিনি তাঁহার প্রিয় অনুষ্ঠানেও অতি তৎপর

তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে—জ্ঞানোদ্ভব ভক্তিই সাধকের সৎকর্মের প্রবৃত্তি। যে স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইবে, সে স্থানে বুঝিতে হইবে, আসল ব্যাপারে গলৎ আছে বিশেষ ত্রুটি আছে হয় বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাব, না হয় শুদ্ধ অনুরাগের অভাব ইহা ভিন্ন এ ব্যাপারে অন্য কিছুর আরোপ করিবার থাকে না বা থাকিতে পারে না।

# সাধ্য কি ?

ইতঃপূর্ব্বে যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের প্রসঙ্গ করা গেল, তাহা লাভ করাই সাধনের উদ্দেশ্য জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মকুশলতাই মানবের উপার্জ্জনীয় মানব জ্ঞানবান্ জ্ঞানবতী হইবে—ভক্তিমান্ ভক্তিমতী হইবে এবং পরম প্রিয় পরমেশ্বরের প্রিয় অনুষ্ঠানরূপ সাধুকার্য্যে কুশলতা লাভ করিবে, ইহাই তাহার সর্ব্বতোভাবে —সর্ব্ব সময়ে উপার্জ্জনীয় ইহাই তাহার সর্ব্বাবস্থায় কল্যাণকর সম্পদ্

দিব্য জ্ঞানোদয়ে সাধক পরম ঐশ্বর্য্যবান্ পরমসুন্দর ভূমানন্দ পরমেশ্বরের পরিচয় পাইবে,—তাঁহাকে সত্যভাবে চিনিতে পারিবে তাঁহাকে চিনিলে এবং প্রকৃতভাবে তাঁহার পরিচয় ও আস্বাদন পাইলে, আপনাহইতে অতি সহজেই সাধকে—পরানুরক্তির সমাগম হইবে মানব পরমেশ্বরের পরিচয় পাইবে আর তাঁহাতে অনুরক্ত হইবে না, এমন হইতে পারে না পরম প্রভু যখন আনন্দময়— রসস্বরূপ এবং তিনি যখন পরম সুন্দর, তখন তাঁহার আস্বাদন ও পরিচয় পাইলে, তাঁহাতে মুগ্ধ হওয়া—তাঁহাতে অনুরক্ত হওয়া—ইহাই ত স্বাভাবিক ব্যাপার জ্ঞানোদয়ে ভক্তির

সঞ্চার এবং ভক্তির সঞ্চার হইলেই ভক্তবৎসলের প্রিয় অনুষ্ঠান রূপ কার্য্য কুশলত লাভ এই তিনটিই মানবের একান্ত উপার্জ্জনীয় ইহাই তাঁহার সাধ্য সাধনের ইহাই অস্তি প্রয়োজনীয়তা

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিন মহা সম্পদ্‌ই প্রত্যেক সাধকের প্রাপ্য ও উপার্জ্জনীয় কেহ শুধু জ্ঞান লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইবেন অথবা কেহ শুধু ভক্তিসাধনে নিযুক্ত হইয়া, ভক্তির উপার্জ্জনেই নিযুক্ত থাকিবেন, অথবা কেহ যে শুধু কর্ম্মী হইয়া কর্ম্মকুশলত লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইবেন, এমন নহে; তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ধর্ম্মজীবনলাভ হয় না ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্বই এই যে, এ ধর্ম্মাশ্রিত প্রত্যেক সাধকই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম যোগে যোগী হইয়া, জীবনের সার্থকতা লাভ করিবেন আমাদের সংগীতে আছে—"জ্ঞান, ভক্তি কর্ম্মযোগের একত্র কর সাধন" ইহাই সর্ব্বাবয়বযুক্ত সাধন ব্যবস্থা ইহাই সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণলাভের উপায় এবং সমুচ্চ পূর্ণ আদর্শ

## লভনীয় কি?

ধর্ম্মসাধনের চরম পুরস্কার কি? লভনীয় কি? কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্ম্মসাধনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা? শাশ্বতী শান্তি এবং পরমানন্দ—ভূমানন্দ লাভকেই সাধারণতঃ ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠ ফললাভ বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু শাশ্বতী শান্তি বা ভূমানন্দ লাভকেই ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বা লাভ বলিয়া গণনা করিলে, ধর্ম্মসাধনজনিত লাভকে কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব করা হয়—ধর্ম্মসাধনের প্রয়োজনীয়তার মহিমার লাঘব করা হয়। প্রকৃতরূপে ধর্ম্মসাধিত হইলে, সাধক আনন্দ শান্তি প্রভৃতি ত পাইবেনই। কিন্তু তাঁহার সে লাভ মুখ্য বা পরমলাভ নহে। তাহা আনুষঙ্গিক লাভ। পরমেশ্বরের প্রসাদে উৎকৃষ্ট জীবন লাভ হইলে আনন্দ শান্তি প্রভৃতিও সাধক জীবনে সমাগত হইবেই—তাহাকে শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য লাভ বলা সঙ্গত নহে। আনন্দ, শান্তি প্রভৃতির লাভকে লক্ষ্যস্থলে রাখিলে, তাহাতে লাভক্ষতিগণনারূপ বিষয়বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ধর্ম্মসাধকের সম্মুখে কোন্ লক্ষ্যকে রাখিতে হইবে? কোন্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে—ইহাই বলিতে হইবে যে, সাধক—প্রকৃত সুস্থ হইবার জন্য, স্বাস্থ্য লাভের জন্য অথবা ঐশ্বরিক প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবার জন্যই সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। জ্ঞাতসারে পরমেশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইয়া—তাঁহার সহবাসে অবস্থিতি করিবার সুযোগ লাভই, জীবাত্মার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় পরমেশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত হইয় এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হইয় অবিচ্ছেদে অবাধে তাঁহার সহিত বাস করিবার সুযোগ লাভ করা এবং তাঁহাতেই অনুরক্ত হইয়া, তাঁহারই আনুগত্য লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়াই, সাধকের সাধনে প্রবৃত্ত হইবার বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত এরূপ অচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত হইলে, তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বাসের সুযোগ পাইলে, পরমঐশ্বর্য্যময়ের—পরমসুন্দর ও আনন্দময়ের সহবাসজনিত ভূমানন্দ—মহতীশান্তি জীবনে সমাগত হইবেই তাহা লক্ষ্যস্থলে থাকিবে না লক্ষ্যস্থলে থাকিবে ঐশ্বরিক প্রকৃতি লাভ করা, সম্যক্ স্বাস্থ্যলাভ করা। তাহা হইলেই সাধকের জীবনে ঐশ্বরিক পরম সম্পদ্ সমূহ সমাগত হইয়া—সাধক কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইবেন তাঁহার জীবন ও জন্ম লাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য-তাহাতেই সিদ্ধ হইবে

সাধকের উক্ত প্রকারেব উদ্দেশ্যসিদ্ধিলাভেব পথে প্রধান অন্তবায ব বাধা কি? তাহাব সাধাবণ নাম পাপ যাহা ঈশ্বব হইতে মানুষকে যেন বিচ্ছিন্ন করিয়, তাঁহাব বিরুদ্ধ প্রকৃতি বিশিষ্ট কবিয়, বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করিয়া বাখে তাহাকে দীন হীন করিয় অতি রুগ্ন, দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করিযা রাখে, তাঁহারই নাম পাপ পাপের যে স্বাধীন বা বাস্তবিক একটা সত্তা আছে, তাহা নহে মানুষ মোহজনিত অজ্ঞতা হইতেই ঈশ্বরেব বিরুদ্ধাচব' কবিতে থাকে, তাঁহাব সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং বিরুদ্ধাচবণজনিত রোগে আক্রান্ত হইয়া অতি মলিন—অতি দীনহীন ভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় এই যে ঈশ্ববের বিরুদ্ধাচরণ, তাঁহাব সহিত বিবোধ, ইহাই পাপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাই ঈশ্বরের সহিত যোগেব অন্তবায এই অন্তরায় হইতে, যোগের দারুণ বিঘ্ন হইতে অব্যাহতি পাইলেই যে, সাধকেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তাহাও নহে নিষ্পাপ হইয়া—শুদ্ধপ্রকৃতি লাভ করিয়া, পবম শুদ্ধ সুন্দর পরমেশ্ববেব আস্বাদন ও পরিচর্য পাইয়া, তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত হইতে হইবে এবং তাঁহাবই সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগে যুক্ত হইয়, ঘনিষ্ঠ ও মধুব সম্বন্ধে আবদ্ধ হইযা, জীবন যাপন কবিতে হইবে

মূল লক্ষ্য সুস্থ হওয়া ঐশ্বরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া এবং ঈশ্বরের হওয়া। তাহা হইলে সাধকের জীবনে সৌন্দর্য্য, শুদ্ধতা, উদার প্রেম প্রভৃতির সমাগম হইবেই তখন আত্ম পরমাত্মার অতুল সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য আদিতে মুগ্ধ হইয়া, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই প্রিয়তম বলিয়া জানিবে তখন তিনিই হইবেন—

"প্রেয় পুত্রাৎ প্রেয়বিত্তাৎ প্রেয় অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ "

সেই অবস্থায় সাধক

"সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা
ভবতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতোভবতি "

আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া তিনি আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয়গ্রন্থিসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন

## সাধনের প্রয়োজনীয়তা

মানবের জন্য যে পরম সম্পদ্ আছে, যাহা পাইয়া সে কৃতার্থ হয়, ধন্য হয়—তাহার জীবন সার্থক হয় এবং যাহা না পাইলে তাহার দুঃখের সন্তাপের পরিসীমা থাকে না, যাহা প্রাপ্ত না হইবার অবস্থাকে ঋষি "মহতী বিনষ্টি" নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই পরম প্রার্থনীয় অবস্থায় মানব কিরূপে যাইবে? সে মহা সম্পদ্ সে কিরূপে পাইবে? এ জিজ্ঞাসার উত্তরে কৃপাবাদী প্রায় সকলের মুখ হইতেই এই উত্তর আসিবে বা আসিয়া থাকে যে, মানব দাতা দয়ালু প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রসাদেই এই সর্ব্বোত্তম পরম প্রার্থনীয় সম্পদ্‌কে লাভ করিতে পারে ও করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে কৃপাবাদী ভক্তগণের মধ্যে মতদ্বৈধ হইবার কথা নাই। যদিও মহামুনি শাক্যসিংহের উক্তি ও ব্যবস্থাতে অন্য তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি আত্মপ্রভাব ও সাধনদ্বারাই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনার কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কথা যে মূল্যহীন তাহাও বলা যায় না। সাধনের চেষ্টার উপরে প্রেমময়ের কৃপা অবতীর্ণ হইয়াই তাহাকে সিদ্ধি দান করিয়া থাকে। ঈশ্বর প্রসাদকে সিদ্ধিলাভের পথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল ও উপায়রূপে

স্বীকার করিয়া লইলেও, মানুষ চুপ করিয়া—নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে না। সাধনবিমুখ নিশ্চেষ্টের নিন্দাও অল্প নহে। প্রাচীন কালের ঋষি তপোধন হইতে আরম্ভ করিয়া, কথঞ্চিত আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা মহর্ষি ঈশ মহম্মদ এবং আধুনিক যুগের সর্ব্ব শ্রেণীর উপদেষ্টাগণই সাধনহীনকে ভৎর্সনা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মন্দিরে মন্দিরে—বেদীসমূহ হইতে লোককে সাধনরত হইবার জন্য কেবলই উদ্দীপনা ও প্রেরণা আসিতেছে। সাধনহীন লোকের নিন্দার আর শেষ নাই।

সাধন পথে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যেমন অনুরোধ, উপরোধ, উত্তেজনা, প্রেরণা আসিতেছেই, তেমনি নানা ভাবে সাধনপ্রণালীর আবিষ্কার ও প্রচারও হইতেছে। জগতে সাধনপ্রণালীই বা কত আছে। একদিকে ঈশ্বর প্রসাদ ও তাঁহার করুণাকেই এ পথের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ও উপায় বলা হইতেছে, অন্যদিকে আবার সাধনরত হইবার জন্য নানা প্রকারের অনুরোধ উপরোধ প্রেরণা উদ্দীপনাদি আসিতেছে—এই দুই বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যাপারের প্রকৃত সামঞ্জস্য ও মীমাংসা কি? কিন্তু বাস্তব ব্যাপার যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়—তাহার মূল কথা এই যে স্থলে চেষ্টা,

উদ্যোগ, সাধনপ্রয়াস আছে, সে স্থলেই কিছু না কিছু সুফল প্রাপ্তি ঘটে সে স্থলেই অনেক পরিমাণে সেই প্রার্থনীয় অবস্থার উপস্থিতি বা সফলতা লাভ ঘটে নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি যে হঠাৎ আধ্যাত্মিক সম্পদ্ পাইয়া উচ্চতম প্রার্থনীয় অবস্থায় সমুপস্থিত হইল, এমন ত দৃষ্ট হয় না ঘটনাক্রমে হঠাৎ পরিবর্ত্তন ও প্রাণমনের গতির পরিবর্ত্তনের ইতিবৃত্ত জগতে আছে, কিন্তু পরিবর্ত্তিত ব্যক্তিকে যে সাধনরত হইয়াই—সংশোধিত ও উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে হয়, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই ধর্ম্মরাজ্যের ইতিবৃত্তে সেই কথাই প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে

তবে উক্ত জিজ্ঞাসার বা সমস্যার প্রকৃত সমাধান বা মীমাংসা কি ? ঈশ্বরপ্রসাদ ভিন্ন হয় না, আমার চেষ্টা ও প্রয়াসেরও প্রয়োজনীয়তা অল্প নহে এই দুই কথার সমীচীন মীমাংসা তবে কিরূপে হইবে ? এ সম্বন্ধে বাস্তব ঘটনা যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, ঈশ্বরপ্রসাদ ও তাঁহার করুণা এবং মানবের সাধনচেষ্টা -উন্নত অবস্থায় যাইবার জন্য সাধকের নিয়ত প্রযত্ন—এই দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে করুণাময়ের করুণা এবং সাধকের সাধনচেষ্টা এই দুইয়ের সম্মিলনেই কল্যাণপ্রার্থীর জীবনে কল্যাণ

সমাগত হয়, এই দুই যেখানে আছে, সেখানেই সুফল ফলিয়া থাকে জগতের ধর্ম্মেতিহাসে এই তত্ত্বই বর্ণিত হইয়া আছে এবং সকল সময়েই এই তত্ত্বই প্রচারিত হইতে থাকিবে শুধু করুণাবাদীর কথায়ও সম্পূর্ণ সত্য নাই শুধু আত্মপ্রভাবের পক্ষপাতী, আত্মবলে সিদ্ধি লাভের প্রয়াসীর কথাতেও সম্পূর্ণ সত্য নাই সাধন ও সিদ্ধিদাতার প্রভূত করুণাই সিদ্ধিলাভের উপায়

দুর্ব্বল মানবের জন্য মহান্ প্রভু করুণাময় পরমেশ্বরের করুণাধার সর্ব্বদাই প্রবাহিত আছে তাহার বিরাম বিশ্রাম নাই তিনি তাঁহার সন্তানদের প্রয়োজন ও অভাব জানেন, আবার তাহাদের দুর্ব্বলতাও অবগত আছেন এজন্য মানবের দুঃখ, দৈন্য দূর করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিধান আসিতেছেই "অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে" ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহার করুণা নিয়তই আছে বিধানও প্রতিনিয়তই আসিতেছে তথাপি জগতের নরনারীর অবস্থা এমন মলিন ও হীন কেন?

"লোভে দুরাশায় চিত্ত লালায়িত, ভোগ বিলাসের অধীন,
ভজন সাধনে অলস, ষড় রিপুর পরবশ,
বিষয়বাসনার দাস হয়ে আছি চির দিন

হিংসা দ্বেষ অভিমানে, স্বার্থসুখ প্রলোভনে,
জীবন কলঙ্কিত অবিনীত, প্রেম অনুরাগ বিহীন
নাহি ভক্তি নাহি জ্ঞান, বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান,
মোহে হৃদয় ম্লান পাষাণ সম কঠিন।

সংগীতের বর্ণনানুরূপ অবস্থাই ত অধিকাংশ লোকের উক্ত প্রকারের আক্ষেপ পায় সকলকেই করিতে হয় ধর্ম্মে হীন, প্রেম পুণ্যে হীন ভজন সাধনে উদাসীন লোকের সংখ্যাই ত অত্যধিক একপ কেন হয়? কেন বিধাতার বিধানের উৎকৃষ্ট ফল প্রায়শঃ ফলযুক্ত হয় না? নরনারী কেন তাঁহার বিধানের উৎকৃষ্ট ফল পাইয়া শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম অবস্থা লাভ করিয়া জগতে স্বর্গের অনুপম মাধুর্য্য—সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার সুযোগ পায় না? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সাধারণতঃ এই ভাবের কথাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, পরমেশ্বর বলপূর্ব্বক কাহাকেও আপন বিধির অধীন করেন না তিনি যে সন্তানকে ক্ষুদ্র একটু স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সম্মান করিতে তিনি জানেন তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া, তাহাকে প্রতিহত করিয়া সন্তানের উপরে আধিপত্য স্থাপনের ভাব তাঁহাতে নাই সন্তান আপনা হইতে স্বেচ্ছায় তাঁহাকে মানিবে, স্বীকার করিয়া লইবে, তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিবে, ইহাই

তাঁহার অভিপ্রায়, সাধন ও প্রচেষ্টাদ্বারা সে তাঁহার মঙ্গল বিধির সুফল লাভ করিবে, ইহাই তাঁহার শুভ ইচ্ছা। নিশ্চেষ্ট সন্তান যে উত্তরাধিকারের ব্যবস্থায় পার্থিব পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহাতে তাহার গৌরব কি? সংগ্রামের দ্বারা উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার দ্বারা যে শক্তি ও সম্পদ্ লাভ করে, জগতে তাহারই প্রশংসা, গৌরবের মুকুট তাহার মস্তকেই শোভা পায়। এজন্য কোথাও জোর করিয়া অধিকার করিবার ভাব তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় না—বলপূর্ব্বক সন্তানকে আয়ত্ত করা বা অধীন করিয়া লওয়া, সে ত তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন কার্য্য নহে। সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষে সন্তানকে অধিকার করিয়া লওয়াও কোনই কঠিন কার্য্য নহে। অথচ তিনি যখন তাহা করিতেছেন না, তখন বুঝিতেই হয় যে, সন্তান ইচ্ছাপূর্ব্বক যত্নপূর্ব্বক প্রচেষ্টাদ্বারা তাঁহার অসীম ভাণ্ডারের সম্পদ্ সৌন্দর্য্য আদি লাভ করিবে, তাহা হইলেই সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে, এবং এই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইতেছে যে, ঈশ্বরপ্রসাদ—তাঁহার করুণা এবং মানবের শুভচেষ্টার সম্মিলনেই কার্য্যতঃ সুফল ফলিয়া থাকে। মানবের শুভচেষ্টার উপরে বিধাতার অনুমোদন ও

আশীর্ব্বাদ আসিবেই। তাহা আসিয়াই সর্ব্বত্র সুফল ও সিদ্ধির উৎপত্তি করে।

জগতে ত ইহাই পরিদৃষ্ট হয় যে, কৃষক তাহার জমিটুকু কর্ষণদ্বারা তাহাকে বীজ বপনের উপযুক্ত অবস্থায় লইয়া যায়। তাহাতে সার দেয় এবং জমিতে যে সকল জঞ্জাল ও আগাছার অঙ্কুর থাকে তাহা বিদূরিত করিয়া, শস্যোৎপাদনের অনুকূলে তাহার যাহা করিবার থাকে, সে তাহা করিয়া ক্ষেত্রে বীজ বপন করে এবং সুবৃষ্টির অপেক্ষায় আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে। শস্যোৎপাদনের পূর্ব্বে তাহার যাহা করিবার ছিল, সে তাহা করিয়াই—সুবৃষ্টির আশা করিতে পারে এবং সে তাহাই করে। যখন যথাসময়ে আকাশ হইতে বর্ষার ধারা নামিয়া আসে, তখন সে আনন্দের সহিত স্বীয় শ্রমের সুফল ও পুরস্কার পাইবার আশা করে এবং সময়ে তাহার আশা পূর্ণ হয়।

"অশ্রুপাত ক'রে বীজ করহ বপন রে,
যদি মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্ত্তন রে।"

ইহাই ত সত্য বাক্য। কিন্তু যদি কৃষক আলস্যবশতঃ জমি কর্ষণ না করে, এবং জমি সম্বন্ধে তার আর আর যাহা করিবার থাকে, তাহা যথাসময়ে না করে, তবে আকাশ হইতে বর্ষার ধারা বর্ষিত হইলেও, সে তাহার কোন সুফলই

প্রাপ্ত হয় না তাহাকে আক্ষেপের সহিত ক্ষোভ, ক্ষতি ও পরিতাপই পাইতে হয় বৃষ্টি আসিবেই, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কৃষকের যাহা করণীয়, সে যদি তাহা না করিল, তবে সেই বৃষ্টির ধারা আগমনের ফল সে আর কিরূপে পাইবে? এস্থলে ইহাই ত পরিলক্ষিত হইল যে, মানবের চেষ্টার উপরে বিধাতার আশীর্ব্বাদ, অনুমোদন ও কৃপা আসিয়াই চেষ্টাকে সাধন প্রয়াসকে ফলযুক্ত করে শুধু চেষ্টাতেও তেমন ফল পাওয়া যায় না, শুধু বিধাতার বিধানের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলেও হয় না সাধন ও পাচেষ্টা, বিধাতার বিধান ও কৃপা, এ দুয়ের মিলনেই সর্ব্বত্র কার্য্য হইতেছে, সুফল ফলিতেছে তবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, যে, বিধাতার প্রসাদ ও মানবের সাধনপ্রচেষ্টা এ দুয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে এই দুয়ের মিলনেই সর্ব্বত্র সুফল ফলিয়া থাকে

এস্থলে কথা উঠিবে উঠিতে পারে, যে, যিনি আমাদের জীবনের বিধাতা, নির্ব্বাহকর্ত্তা ও নিয়ন্তা, তিনি কি তাঁহার মঙ্গলকার্য্যকে অবরুদ্ধ রাখেন? তাঁহাতে যে আমাদের জন্য মঙ্গল অভিপ্রায় নিয়ত বর্ত্তমান, তাহা কি আমাদের অচেষ্টা, আলস্য ও উদাসীনতা দেখিয়া নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হইয়া থাকে? তাহা হইলে তাঁহার নিয়ত

বিধাতৃত্ব প্রভৃতির সার্থকতা কি ? তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন বা আছেন এমন হইতে পারে না তাঁহার শুভ অভিপ্রায়ের বিরতি নাই তিনি নিষ্ক্রিয়ও নহেন তবে তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর মর্ম্ম আমরা অবগত নহি ইহাই বলিতে হইবে অনন্ত জ্ঞানময়ের কার্য্যপ্রণালী ক্ষুদ্র ও সামান্যজ্ঞান লোকের সম্যক্ অবগত হইবার কি সম্ভাবনা আছে ?* দেখা যায়, মানবগণ আপনমনে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করে, সে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যায়, যাইতে যাইতে পথ অতিক্রম করিতে করিতে কত আঘাত পায় সে যে ঘাতপ্রতিঘাত পাইতে থাকে, তাহা আর কিছুই নহে, তাহা সেই পরমপিতারই ব্যবস্থা সে তখন আপন বুদ্ধি ও শক্তির গর্ব্বে এ সকলকে গ্রাহ্যই করিতে চায় না—আপনমনের ক্ষুদ্র আলোকেই সে চলিতে থাকে এভাবে চলিতে চলিতে তাহার জীবনে এমন সময় আসে, যখন তাহার বুদ্ধিতে আর কুলায় না, সে আর পথ চলিতে পারে না তখন তাহার চেতনার সঞ্চার হয়, বিধাতার বিধান তখন তাহাতে জয়যুক্ত হয় যে সহজে বশীভূত হইল না, তাহাকে নানাপ্রকারে আঘাত দিয়া তার জন্য নানা ব্যবস্থা করিয়াই তাহাকে পরাজিত করিতে হয়—বাধ্য ও সুস্থ করিয়া লইতে হয়

যে সহজে চেতন লাভ করে না, সুপথের পথিক হয় না, বিধাতার বিধানের সুফল পাইতে তাহার অনেক বিলম্ব হয় এ জন্যই লোকে মনে করে, বিধাতার বিধান বুঝি অবরুদ্ধ হইয়া আছে—বিধাতা বুঝি নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হইয়া আছেন পৃথিবীতে দেখা যায় সন্তানটি দুর্ব্বৃত্ত হইয়া অবাধ্য হইয়া কাল কাটাইতেছে, অশিষ্টাচরণ করিতেছে, তখন পিতা ধাইয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং বলপূর্ব্বক তাহাকে আর সে মন্দ আচরণ করিতে দেন না পৃথিবীর পিতার কার্য্যপ্রণালী এ প্রকারের পরমপিতা মঙ্গলবিধাতাও তাহাই করেন, তবে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী অন্যবিধ তিনি তাঁহার রীতি অনুসারে তাহা করেন আমরা যে অনেক সময় হঠাৎ রুগ্ন হইয়া—কাণা হইতে সকল প্রকারের তাঁহার অপ্রিয় অনুষ্ঠান হইতে বিরত হই বা কার্য্যের সামর্থ্যহীন হই, তাহার আর অন্য উদ্দেশ্য কি? যাহাহউক ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত যে, বিধাতা নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন নহেন তিনি তাঁহার প্রণালী অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন

তিনি অতি ধীরে ধীরে কার্য্য করেন কত দীর্ঘ কালে এ পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে—তাহার হিসাব যাঁহারা করেন, তাঁহারা তাহা কিয়ৎপরিমাণে

জানেন তিনি তাঁহার সন্তানকেও ধীবে—অতিধীবে বশীভূত কবিয় থাকেন এবং তাহাকে সাধুকার্য্যের ও যোগ্য সন্তানেব উপযুক্ত কবিয়া তুলেন কুম্ভকাব যেমন প্রথমে মৃত্তিকাকে আপনকার্য্যের উপযুক্ত কবিয় লইবাব জন্য কোমল কবিয়া লয় তাহাকে নিজ প্রয়োজন সাধনেব অনুকূল ও কার্য্যেব বাধাদানে অক্ষম করিয় লয়, পবে সে সেই মৃত্তিকাদ্বাব আপনার অভিপ্রায়মত সব কার্য্য সাধন করিবাব সুযোগ পায়—ইচ্ছানুরূপ পাত্রসকল প্রস্তুত কবিয় থাকে, পবমপিতা পরমেশ্বরও যেন সেই ভাবেই তাঁহাব সন্তানদিগকে কোমল, সরল ও তাঁহাব ইচ্ছাসাধনেব অনুকূল করিয়া লইয়, আমাদের দ্বারা যাহা কবাইবার থাকে, তাহাই কবিয়া থাকেন সন্তানগণকে যেরূপে পরিণত করা তাঁহার ইচ্ছা, তাহাই কবিয়া থাকেন বাধ্য হইবার, এবং সন্তানত্বলাভের বুদ্ধিব তাবতম্যে ফলেব তারতম্য সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে

পৃথিবীতে অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হয় যে, পিতাব সম্পত্তি সকল সময় সর্ব্বস্থানে সন্তানের ভোগে আসে না সন্তান যখন আপনাব দুর্ব্বৃত্ততা, দুঃশীলতা, অবাধ্যতা প্রভৃতিদ্বাবা পিতার সন্তানত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, আপনাকে পিতৃ স্নেহ ও প্রীতি, পাইবাব অনুপযুক্ত

করিয়া ফেলে, তখন সহজেই সন্তান পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয় পিতামাতার স্নেহাভাবে নহে কিন্তু তাঁহাদের স্নেহ, প্রেম পাইবার অনুপযুক্ত হইয়াই পৈতৃক সম্পদ্ হইতে সে বঞ্চিত হয় পিত মাতা অনুভব করেন যে, তাঁহাদের সন্তান এমন অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, সে আর সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করিবার উপযুক্ত নহে, সে তাহা পাইয়া আরও অশান্ত, দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিবে সম্পত্তির অপব্যবহার করিবে, তখন তাঁহার সন্তানকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন এবং বরং সম্পর্কহীন কোন উপযুক্ত পাত্রকে সম্পত্তির অধিকারী করেন, কিন্তু সন্তানের যে ন্যায্য অধিকার ছিল, তাহাও তাহাকে প্রদান করেন না প্রেমের বা স্নেহের অভাবে নহে, কিন্তু তাহার কল্যাণ-বাসনা হইতেই এরূপ ব্যবস্থা করেন—সম্পত্তির সদ্ব্যবহারের অভিপ্রায়েই এরূপ করিয়া থাকেন মানবের ব্যবহারে যাহা প্রত্যক্ষ হয়, পরমেশ্বরের ব্যবহারেও তাহাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহার প্রেম আছে—তাঁহার করুণা আছে, তাঁহার শুভ অভিপ্রায় আছে, এবং তাঁহার সম্পদ্ সমূহও আছে কিন্তু অযোগ্যকে, অপাত্রকে তিনি তাহা দেন না আপনার ব্যবহার দ্বারা, চরিত্রদ্বারা যখন সে ঐ মহা সম্পদ্‌সমূহ

পাইতে আপনাকে অনধিকারী করিয়া ফেলে, আপনাকে সেইরূপ দুর্গতিগ্রস্ত বলিয়া প্রমাণিত করে, তখনই সে পায় না—এদিক্ দিয়া দেখিলেও সাধনের প্রয়োজনীয়তা সমধিক প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উপনিষদের নিম্নোক্ত উক্তিকেও এই কারণেই সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। উপনিষদে আছে—

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।"
ইহার দুই প্রকারের অর্থ ব্যাখ্যাকারগণ করিয়াছেন। এক প্রকার ব্যাখ্যা এই—'যাঁহাকে ইনি অর্থাৎ পরমাত্মা আত্মদর্শনার্থ বরণ করেন, তাঁহাদ্বারাই ইনি লভ্য, তাঁহার নিকটে তিনি স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন।" অন্যপ্রকারের ব্যাখ্যা এই—"যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।'

পরমাত্মা আত্মদর্শনার্থ যাহাকে বরণ করেন, সেই তাঁহাকে জানিতে পারে, পরমাত্মা তাহার নিকটেই আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।' এ উক্তিদ্বারা কি ইহাই অনুমান বা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, পরমাত্মা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকেই এই উচ্চ অধিকার প্রদান করেন, বাছিয়া বাছিয়া কাহাকেও আত্মদর্শনরূপ মহা সম্পদ্ দান

করেন—অপরকে তাহা হইতে বঞ্চিত করেন অন্য হেতু হীনভাবে যদি ইহা হইতে থাকে, তবে তাঁহাকে সর্ব্বভূতে সমান সকলের কল্যাণবিধাতা পিতা বলা সঙ্গত হয় না—প্রত্যুত পক্ষপাত দোষেই তিনি দুষ্ট হইয় পড়েন কিন্তু তিনি সকলের পক্ষে সমান, তিনি সকলের পিতা, সকলের কল্যাণ-সাধন করা—সকলকেই মহা সম্পদ্ দান করাই তাঁহার স্বভাব তবে ঐ উক্তির সার্থকত কি? সে সার্থকত এই যে, যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, এবং আপনার স্বচেষ্টাদ্বারা আপনাকে ব্রহ্মকৃপা লাভের অধিকারী করে যে আপনাকে তাঁহাকর্ত্তৃক বৃত হইবার উপযুক্ত অবস্থায় লইয়া যায়, তাহাকেই সেই পরমাত্মা আত্মদর্শনের জন্য বরণ করেন এ স্থলেও সাধনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাই পরিলক্ষিত হইতেছে আমাদের সংগীত সমূহে এই সাধনের প্রয়োজনীয়তা নানাপ্রকারে অতি বিস্তৃত ভাবেই সমর্থিত হইয়াছে—সংগীতে সাধন সম্বন্ধে কত কথাই আছে; বলা হইয়াছে :—

"সাধনের ধন হৃদয়-রতন, ভক্ত-হৃদে পরশমণি,
ঐ পরশ লাগি যোগে যোগী জাগিছে দিবস রজনী ।

বলা হইয়াছে :—"সাধন বিনা সে ধন মিলে না ’

"দয়াময় নাম সাধন কর, সাধনেতে সিদ্ধ হবে

এই ভাবে দেখা যাইবে, সাধনের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্ব সময়েই নানা ভাষায়, নানা কথায় পরিব্যক্ত হইয়া আসিয়াছে যে কৃপাকে সম্যক্ উৎকর্ষ, সমস্ত কল্যাণ লাভের হেতু বলা হয়, সেই কৃপা পাইবার জন্যও সাধন রতই হইতে হইবে। অচেষ্টায় পরমসম্পদ্ পাইবার আশা কোথায় ?

## সাধন প্রতিনিয়ত—সাময়িক নহে

পূর্ব্বে যে সাধনের কথা বলা হইল, তাহাব লক্ষণ যাহাই হউক, সাধন সকলকেই করিতে হইতেছে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলকেই এই সাধনে রত হইতে হইতেছে শরীর রক্ষার জন্য, বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য, কার্য্যের উপযুক্ত হইবার জন্য, মানবকে সাধনে রত হইতেই হয় ঐ যে শিশু জাগ্রতাবস্থায়—নিয়তই আপনার হস্তপদ সঞ্চালন করিতেছে উহা তাহার পক্ষে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও শক্তি প্রভৃতি লাভের জন্য সাধন সে স্বভাবের তাড়নায়—প্রেরণায় অজ্ঞাতসারে তাহা করিতেছে উক্ত কার্য্যে বাধা পাইলেই সে ক্ষুণ্ন হইয়া থাকে শিশুর গতিশীল হইবার জন্য অবিরাম প্রয়াস দাঁড়াইবার জন্য—চলিবার জন্য তাহার চেষ্টার বিরতি নাই সে নিয়তই সাধনে রত হইয়া দাঁড়াইতে ও চলিতে শিখে তাহার প্রত্যেক ব্যাপারেই সেই সাধনপ্রবৃত্তির পরিচয় দেয় তাহার পরে ভাষাশিক্ষার জন্য সে নিয়ত সাধনে রত থাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাধ্য হইয়, তাহাকে অতি কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় কত চেষ্টায় সে লিখিতে সমর্থ হয়—লিখিবার জন্য তাহাকে কত না পরিশ্রম করিতে হয় যে হস্ত সোজা

রেখা টানিতে পারে না -কতকালের অভ্যাসে তাহাকে ইচ্ছামত অক্ষর লিখিবার শক্তি লাভ করিতে হয় এই-রূপে তাহার সাধনচেষ্টা নিয়তই চলিতে থাকে যে অনলস হইয়া নিয়ত চেষ্টাপরায়ণ হয়, সেই সময়ে বিদ্বান্ হইয়া জ্ঞান প্রসূত বিমল আনন্দ ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয় থাকে। সংগীত শিক্ষার্থীকে কতই যত্নে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কণ্ঠের স্বরকে নিজ আয়ত্তে আনিতে হয় তাহাকে ঐ চেষ্টায় প্রতিনিয়তই নিযুক্ত থাকিতে হয়

এইরূপ বাদ্য শিক্ষার্থীকে ও চিত্রশিক্ষার্থীকে আপন আপন হস্তের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য, প্রতিনিয়ত কতই চেষ্টাপরায়ণ হইতে হয় তা না হইলে, কেহই সুচিত্রকর বা সুবাদক হইতে পারে না প্রত্যেক শিল্প শিক্ষার্থীকে কত কাল ধরিয়া, সেই শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত হইবার আয়োজন করিতে হয় সাধন ইহারই নাম পৃথিবীতে কর্ম্মী হইতে হইলে, সুবিদ্বান্ হইতে হইলে, সুশিল্পী, সুবাদক, গায়কাদি হইতে হইলে, যেমন প্রতিনিয়ত সেই সাধনচেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতে হয়— ধর্ম্মপথের পথিক্কে, আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লাভার্থীকেও সেইরূপ নিত্য নিয়মিতরূপে সাধনে রত থাকিতেই হয়। এ মহা সম্পদলাভ কি বিনা সাধনে পাওয়া যাইবে?

নিত্য নিয়মিতরূপে একান্ত নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা, একান্ত আগ্রহ ও আশার সহিত নিয়ত চেষ্টা এবং তাহাতে নিযুক্ত থাকা—তাহারই নাম সাধন

অতি নিপুণ চিত্রকর আপনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া যদি একটি নিখুঁত চিত্র আঁকিতে পারেন, তবে, তাহা কীটাদি কর্ত্তৃক বিনষ্ট না হইলে, বহুকাল পর্য্যন্ত আপন সৌন্দর্য্যদ্বারা দর্শককে তৃপ্ত করিতে পারে এবং করিয়া থাকে উত্তম শিল্পীর নির্ম্মিত শিল্পসম্ভার বহুদিন লোকের তৃপ্তি ও প্রয়োজন সাধন করিতে পারে তাহা যেরূপে রক্ষিত হয়, সেরূপেই সে থাকিতে বাধ্য পরিবর্ত্তনাদি তাহাতে পরিলক্ষিত হয় না কিন্তু মানবের ধর্ম্মজীবন সেরূপ নহে তাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জীবন্ত যাহা, তাহাই পরিবর্ত্তনশীল পরিবর্ত্তন তাহাতে ঘটিবেই। যে স্থানে পরিবর্ত্তন নাই, সে স্থানে জীবন আছে, বলা সাজে না এজন্য ধর্ম্মজীবন লাভের উদ্দেশে যে সাধন, তাহা নিত্য গতিশীল হইবে তাহা প্রতি-নিয়ত চলিষ্ণু না হইলে, কোন মতেই চলে না যদি এমন কেহ মনে করেন, বিশেষ যত্নে, বিশেষ চেষ্টায় ও আয়োজনে—জীবনকে এমন এক অবস্থায় লইয়া যাইবেন, যখন সে জীবনের জন্য আর কিছুই করিতে

হইবে না, সিদ্ধিলাভ করিয়া, স্থিবতব হইয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে, নিরুদ্যম হইয়া কাল কাটাইবেন, তবে তাঁহার সেরূপ মনে করাকে,—সিদ্ধান্ত করাকে, সমীচীন বলিয়া গণনা কবা যাইতে পারে না কারণ আত্মা-জীবন্ত ও নিত্য উন্নতিশীল ও পবিবর্ত্তনশীল তাহাকে কোন একটা অবস্থাতে লইয়া গিয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া শান্ত হইয়া, বসিয়া থাকিলে চলিবে না. সে পবিবর্ত্তিত হইবেই যদি তাহাকে উন্নতিব দিকে লইয়া যাইতে না পার, তবে সে যে অবস্থায় গিযাছিল, সেই অবস্থাতেই যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, এমন নহে সে অগ্রগতিব অভাবে পশ্চাদ্‌গতি পাইবে না হয় নিস্তেজ নির্জীব হইয়া থাকিতে বাধ্য হইবে এজন্য আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লাভের সাধন, ধর্ম্ম-জীবন লাভেব সাধন, একেবারেই সাময়িক নহে সাধন-চেষ্টা যেমন নিত্য হইবে, তেমনি নিয়ত অগ্রগতিশীল হইবে সিদ্ধিলাভেব কথা বিশেষ বিশেষ সম্পদ্ লাভার্থীর পক্ষে খাটিতে পারে—সম্যক কল্যাণ, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও পবমসম্পদ্ লাভার্থীব পক্ষে সে কথ খাটে না. তাহাকে নিয়তই চলিতে হইবে, নিয়তই চলিবার উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য উপার্জ্জনের জন্য এবং সম্পদ্ সমূহ লাভের জন্য, তাহাকে নিয়ত সাধনে রত হইতে হইবে ব্রাহ্ম-

ধর্ম্ম সাধনার্থীর সাধনলব্ধ সম্পদ্ অনন্ত। তাহার গম্য পথ অসীম অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া তাহার পক্ষে সাজে না। অনন্তের পানে চাহিয়া—অনন্তের আকর্ষণে—অনন্তের দিকে তাহাকে কেবলই চলিতে হইবে। অল্পে তৃপ্তি নাই, অল্পে আনন্দ নাই অল্পে আত্মার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য নাই সুতরাং নিয়ত, নিয়ত, নিয়ত কেবলই চলা আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক সেই নিত্য চলিবার মত সঙ্কল্পই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাতেই তাহাকে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাহাকে নিয়তই মনে রাখিতে হইবে—

"ক্ষণেকের শ্রমে হব না রে ম্রিয়মাণ

সে চলিয়া চলিয়া—নিত্য নূতন সম্পদ্, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হইবে—ধন্য হইবে ব্রাহ্মের সাধন অনন্ত গতিশীলের সাধন তাহা পুরাতন হইবে না, শোভাহীন হইবে না তাহা চির নূতন ও সরস থাকিয়া, সাধককে কেবলই অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা দিবে—মাভৈঃ রবে অগ্রসর হইতে বলিবে

# সাধনের প্রকৃতি

জগতের সর্ব্বত্র এই একটি ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, থাকিতে হইলেই চলিতে হয় আকাশে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে, সকলেই চলিতেছে আছে অথচ চলিতেছে না, এমন ব্যাপার কোথাও প্রত্যক্ষ হয় না জড় জগতেই যে ইহ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাই বা কেন ? আত্মজগতেও তাহা বরং আরও স্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে জীবন্ত যাহা, তাহা একভাবে থাকে না, থাকিতে পারে না সুতরাং আত্মার গতি নিয়ত হইবে গতিশীল হইয় থাকাই তাহার স্বভাব, তাহার জীবনের পরিচায়ক এজন্য গীতোক্ত আত্মার লক্ষণ সমীচীন বা উপযুক্ত নহে গীতার মতে আত্মা স্থাণু, অচল, নিত্য ও স্থিরস্বভাব উপচয়, অপচয় তাহার নাই—সে একভাবে থাকে এবং একভাবেই আছে কর্তৃত্ব প্রভৃতি তাহাতে নাই এ লক্ষণ মানা যায় না ইহা মানিলে মানবের সব চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে হয়, তাহার বন্ধন ও মুক্তির কোন অর্থ থাকে না আমরা আত্মাকে নিয়ত ক্রিয়াশীলরূপেই দেখি এবং দেখিতে চাই আমাদের নিকটে আত্মা সম্বন্ধে সকল প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে এই শুভ তত্ত্বই ব্যক্ত

হইয়াছে যে, আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল সে নিত্য নূতন আলোক পাইয়া, সেই আলোকে আপন পথে নিয়ত অগ্রসর হইবে এবং নিত্য নব নব সত্য পাইয়া বলবান ও কৃতার্থ হইবে। তাহার প্রাণের কথা এই—

"সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয় মুখে
চলে যাব গান গাহি, কে রহিবে আর দূর পরবাসে"

আত্মার এই যে নিয়ত গতি, ইহাতে তাহার কোনরূপ অশান্তি ভোগ করিতে হয় না ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইতে হয় না ক্লান্ত হওয়া, পরিশ্রান্ত হওয়া শরীরের ধর্ম চলিতে চলিতে অশান্তি বোধ করাও, শরীরের ব্যাপার আত্মার ধর্ম সেরূপ নহে এজন্যই আমরা দেখিতে পাই, গমনে—গতিতেই সুখ পাওয়া যায় যে বালক বা বালিকা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটাছুটি করিতে থাকে, খেলায় প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করে, এমন কি সেই ব্যাপার হইতে থামাইতে গেলে, যাহারা অসন্তুষ্ট হয় ক্ষুণ্ণ হয়, সেই বালকবালিকাগণকে যদি কোন কারণে বলা যায়, এখানে তোমরা শান্ত হইয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাক, তবে সে কথা তাহারা মানিতে চাহিবে না বাধ্য হইয়া মানিতে গেলে, তাহাতে তাহাদের ভারি কষ্টই হইবে

তাহা তাহারা কোন মতেই পছন্দ করিবে না। ছুটাছুটি করিতে বলিলে তদ্দ্বারা তাহারা কখনও দণ্ড পাইল বলিয়া মনে করিবে না। কিন্তু একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিলে, তাহাকেই তাহারা দণ্ড বলিয়াই গণনা করিবে। ইহাদ্বারা ত জানা যায় যে চলিলেই তৃপ্তি, গতিতেই আনন্দ, না চলিয়া স্থির হইয়া থাকাই অসুখের হেতু।

ধনীর দ্বারে বা ধনাগারের দ্বারে যে প্রহরী অবস্থিতি করে, তাহাদের আচরণে দেখা যায়, তাহারাও এই সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়। তাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াই ত তাদের প্রতি অর্পিত গুরুতর কর্ত্তব্যপালন করে না। তাহারা সর্ব্বদাই গৃহের দ্বারে পায়চারি করিয়া, বেড়াইয়া বেড়াইয়া, সে কার্য্য সমাধা করে। এক স্থানে দাঁড়াইয়া সে কাজ সমাধা করা তাদের পক্ষে ক্লেশকর। এইরূপও দেখা যায়, বোঝা লইয়া যে ব্যক্তি চলিয়াছে, সে হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিতে পারে, চলিয়াও থাকে। কিন্তু সেই অবস্থায় তাহাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিলে, সে তাহাতে কোন মতেই রাজি হইবে না। বোঝা মাথায় লইয়া চলাই বরং আরামের—দাঁড়াইয়া থাকাটা

একেবারেই আরামের নহে এইভাবে পরীক্ষা করিলে জানা যাইবে, গতিতেই আরাম চলিলেই তৃপ্তি সুতরাং আত্মার পক্ষে স্থির হইয়া থাকাটা কোন মতেই শোভন ও প্রার্থনীয় নহে তাহা আরামেরও নহে, জীবনের লক্ষণও নহে আত্মা চলিয়াছে, চলিবে সে নিত্যই জ্ঞান, প্রেম পবিত্রতাদি সম্পদে সম্পদ্‌বান্ হইয়া সুখী ও কৃতার্থ হইবে তাহাতেই তাহার আনন্দ চিরজীবন্ত ভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারিলেই তাহার জীবনের সার্থকতা। *এজন্য চেষ্টা—গতি—সাধনাদি প্রতিনিয়ত হওয়াই আমাদের* স্বভাবের অনুরূপ বিধি—তাহাই কল্যাণকর বিধি তাহার অনুসরণ করাই প্রত্যেক আত্মার পক্ষে একান্ত শোভন ও কল্যাণকর তাহাই সাধনের লক্ষ্য সিদ্ধি বা একভাবাপন্ন হইয়া থাকিয়া যে মুক্তি-পরিকল্পন তাহ মানবের জন্য সুন্দর ও প্রার্থনীয় নহে

# সাধন কি ?

আত্মার এই চির উন্নতিশীল প্রকৃতি হইতে তাহার জন্য দেশে দেশে,—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে,—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, সাধন পদ্ধতি নানাবিধ আকার গ্রহণ করিয়াছে সাধনের প্রকার ও প্রণালীর সংখ্যা করাও দুঃসাধ্য সাধনের বিষয়ও কত নিরূপিত হইয়াছে, তাহার নিরূপণও সহজ নহে সুতরাং সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, আমাদের সম্মুখে কল্যাণবিধাতার বিধানে, প্রেরণায় যাহা সমুপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া যাঁউক মানবের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণপ্রদ সাধন যাহা, তাহাই আমাদের অবলম্বনীয় যাহা সহজে, স্বাভাবিকভাবে আত্মায় সমাগত হয়—যাহা নানা আকারে, নানাভাবে সমস্ত দেশেই সমুপস্থিত হইয়া আসিয়াছে, আমাদের জন্যও সেই সর্ব্বকালের উপযোগী—সর্ব্বাবস্থার উপযোগী, সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর ব্যবস্থা আসিয়াছে তাহার ভাষা সংক্ষেপে এই যে, আমাদের স্রষ্টা, পাতা, পরিত্রাতা বিধাতার পূজা—তাঁহাকে প্রিয়জ্ঞানে তাঁহার পূজা করা বা উপাসনা করা

"একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি"

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। ইহাই আমাদের জন্য একান্ত শুভবার্তা ও পরম কল্যাণকর শুভবিধি। ইহা উদার, ইহা সর্ব্বজনের সর্ব্বকালের—সর্ব্বস্থানে অবলম্বনের উপযুক্ত। ইহাতেই আত্মার সম্যক্‌বিকাশ। স্ফূর্ত্তি, আরাম ও আনন্দের সম্ভাবনা আছে। ইহাতেই সম্যক্ কল্যাণ সম্ভবপর হইতেছে।

এই উপাসনার লক্ষণের সংক্ষিপ্ত ভাষা নিম্নোক্ত প্রকারে—

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। উপাসনার এই লক্ষণদ্বারা সাধনের বিষয়ের সম্পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ঈশ্বরের পূজাপদ্ধতির যে ভাব বা লক্ষণ ছিল, তাহা পূর্ণাঙ্গ নহে, তাহা আংশিক ভাবের ছিল। ঈশ্বরপ্রীতিই তাঁহার পূজা নামে সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হইত। তাহা পূজার অসম্পূর্ণ লক্ষণ। প্রীতি এবং প্রিয়কার্য্য উভয়ই যখন মানবাত্মার বিকাশের—তাহার সার্থকতার সহায়; তখন সেই দুইয়ের সাধন যাহাতে হয়, তাহাই পূর্ণব্যবস্থা। তাহাই একান্ত প্রার্থনীয় ও সম্যক্ কল্যাণকর। আমাদের জন্য সেই পূর্ণ বিধিই সমাগত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পরমগুরুর আশ্চর্য্য দানশীলতাই ব্যক্ত হইয়াছে।

ঈশ্বরকে প্রীতি করা যে তাঁহার পূজা, তাহা সকলেরই জানা কথা—স্বীকৃত কথা। কিন্তু প্রিয়কার্য্যও যে তাঁহার পূজা তাহা লোকের পরিজ্ঞাত ছিল না। প্রিয়কার্য্য যথেষ্টই ছিল ও আছে। কিন্তু তাহাও যে পূজা, এ শিক্ষা বাক্সংস্থ ছিল না। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আমরা যেন বাধ্য সন্তান ও শিষ্যের ন্যায় এই মহা দানকে শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার বিধাতৃত্ব ও প্রতিপালকত্ব শিক্ষাদাতৃত্বকে কার্য্যত মান্য করিয়া চলি, তাঁহার বিধান মানিয়া, সম্যক্ কল্যাণ লাভ করিবার জন্য প্রয়াসী হই।

ঈশ্বরকে প্রীতিকরা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাকেই উপাসনার লক্ষণরূপে পরিগণিত করাতে, সংক্ষেপে মানবের যাহা হওয়া উচিত, তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনীয় যাহা, তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে বলিলে কি বলা হয়? ঈশ্বর ত কোন একটি শূন্যগর্ভ ফাঁপা বস্তু নহেন। তিনি জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতাময় পুরুষ। সুতরাং তাঁহাকে প্রীতি করিতে হইলেই জ্ঞানকে প্রীতি করিতে হয়, জ্ঞানের অনুরাগী হইতে হয়। তাঁহাকে প্রীতি করিতে হইলেই প্রেমেতেই অনুরক্ত হইতে হয়, প্রকৃতিতে প্রেমিক হইতে হয়।

আবার ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে হইলেই, পবিত্রতাতে অনুরক্ত হইতে হয়, নিজের স্বভাবকে পবিত্র করিয়া, পবিত্র হইতে হয় তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে মানবের যাহা হওয়া উচিত, ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে গেলে, তাহাকে তাহাই হইতে হয়। অর্থাৎ তাহাকে জ্ঞানবান্, প্রেমিক ও পবিত্র হইতে হয় ঈশ্বর পরমসুন্দর—তাঁহাকে প্রীতি করিতে হইলেই, আত্মাকেও সুন্দর ও সুন্দরে অনুরক্ত করিতে হয় ইহাপেক্ষা মানবাত্মার জন্য আর প্রার্থনীয় কি আছে? জ্ঞানবান্ হওয়া, প্রেমিক হওয়া, সুন্দর ও পবিত্র হওয়া, এক কথায় বলিলে বলিতে হয়, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া, সম্যকরূপে বিকাশ পাইয়া ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া, তাঁহাতে পরানুরক্তি লাভ করিয়া ধন্য হওয়া, ইহাই ত তাহার পক্ষে পরম পুরুষার্থ, পরম সম্পদ্ প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা সন্তানত্ব ও আনুগত্য প্রভৃতি অবস্থাই তাহাতে সমাগত হইয়া থাকে সুতরাং আমাদের জন্য যে উপাসনারূপ সাধন আসিয়াছে, তাহাদ্বারা আমাদের যাহা হওয়া উচিত, যাহা পাওয়া উচিত, তাহাই হইতে পারিব, তাহাই পাইতে পারিব ইহাই মানবের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণলাভের উপায় বিষয়ী ব্যক্তির বিষয়ে যাদৃশ অনুরাগ সহজেই জন্মিয়া থাকে, নিত্য বর্ত্তমান

থাকে, আত্মার সেইরূপ যেন অনুরাগ ঈশ্বরে নিয়ত থাকে, ইহাই সুধীজনের—ভক্তের একান্ত প্রার্থনা। আত্মা-দের উপাসনারূপ মহাসাধন হইতে সাধকে সেই প্রার্থনীয় অবস্থাই আসিতে পারে, আসিয়া থাকে। ইহ ইহলোকে পরলোকে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই সাধিত হইবার উপযুক্ত। শরীরের সাহায্যে যে সকল বাহ্য উপায় অবলম্বিত হয়, যাহা যোগসাধন নামে অভিহিত, তাহা ইহলোকেই অবলম্বিত হইতে পারে, সুস্থ শরীরের দ্বারা তাহা সাধিত হইতে পারে, কিন্তু আত্মার সাধন সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, ইহলোকে পরলোকে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই অবলম্বনীয় হওয়া উচিত। সর্ব্বাবস্থাতেই অনুকূল ও সাধনের বিষয়ীভূত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং প্রীতি এবং প্রিয়কার্য্যরূপ সাধনই সর্ব্বোত্তম। তাহাই সর্ব্বাবস্থার উপযোগী। মানবপ্রাণ হইতে অন্য প্রকারের প্রার্থনা সংকল্পেরও উদয় হইয়াছে ও হইতেছে। সেটি এই যে, নদী যেমন নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া, সমুদ্রে লীন হইয়া, আত্মস্ববিসর্জ্জন করে, মানবাত্মাও সেইরূপ আত্মহারা হইয়া আপনার আত্মত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, ঈশ্বরে লীন হইয়া ঈশ্বরত্ব পাইতে চায়। এ আকাঙ্ক্ষা অবশ্য ভাল। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই। জীব জীবই থাকিবে, ঈশ্বরত্ব সে পাইবে না।

পাওয়া সম্ভবপর নহে আর তাহাতে লাভই বা কি ? সে যদি না রহিল, তবে তাহার লাভ কি হইল ? সংগীতে আছে

—"চিনি খেতে ভালবাসি, চিনি হ'তে নাহি চাই"

উপনিষদ্ও সেই ব্রহ্মবিদ্গণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন—যাঁহারা আত্মক্রীড, আত্মরতি উপনিষদের ভাষা এই —

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ "

তিনি ( ব্রহ্মবিদ্ ) আত্মক্রীড়, আত্মরতি হন, অর্থাৎ পরমাত্মাতেই ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতেই আনন্দিত হন এবং ক্রিয়াবান অর্থাৎ সৎকার্য্যশীল হন ইনিই ব্রহ্মবিৎ দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এপ্রকার শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মবিৎ হইবার পক্ষে, ব্রাহ্মসমাজ অবলম্বিত সাধন প্রণালী অতি উপযুক্ত সহায় শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ হইবার পক্ষে অনুকূল

# উপাস্যের স্বরূপ

ঈশ্বর প্রীতি এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যই উপাসন শুধু ইহা বলিলেই সম্যক্ বলা হইল না ঈশ্বর কিরূপ, তাঁহার স্বরূপ কি, তাহার জ্ঞানও সমুজ্জ্বল থাকা আবশ্যক ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞানের অভাবে ব সে সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞানে, বা সে বিষয়ে ভ্রান্ত সংস্কারাপন্ন হইলে, কখনও শ্রেয় লাভের সম্ভাবনা থাকে না মানুষ ঈশ্বরকে অনুকরণ করিয়া চলিবে, তাঁহার মতন হইবার জন্যই সমস্ত জীবনব্যাপী চেষ্টায় রত থাকিবে এবং চেষ্টারত হইয়া তাঁহারই মতন হইবে। তাহাতেই তাহার জীবনের সার্থকতা—জীবনের সমগ্র বিকাশ তাহাতেই সে সর্ব্বাংশে সুন্দর ও সুস্থ হইয়া ধন্য হইবে এজন্য ঈশ্বর স্বরূপের জ্ঞান সম্যক্, সুন্দর ও যথাযথ হওয়া আবশ্যক উপাস্যের প্রকৃতি অনুকরণ করিয়াই যখন জীবন গঠিত হইবে, তখন সে প্রকৃতি সুন্দর, সম্পূর্ণ ও পবিত্র না হইলে ত কোন মতেই চলে না তাহার অভাবে এ দেশের সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কত বীভৎস অনুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হইয় আসিতেছে। সে যাহাহউক, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ অতি সুন্দর ও সম্পূর্ণ জ্ঞানই লাভ করিয়াছেন ব্রাহ্ম সমাজের মূলমতে বা বীজমন্ত্রে নিম্নলিখিত রূপে ঈশ্বর-স্বরূপের বা উপাস্যের স্বরূপের বর্ণনা আছে—

"তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়ব
মেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়
সর্ব্ববিৎ-সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি "

তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ, কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত আরাধনার মূলমন্ত্রেও তাঁহার স্বরূপ নিম্নলিখিতরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, ইহা উপনিষদেরই বাণী :—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ "

অর্থাৎ তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম, তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তিনি শান্ত মঙ্গল অদ্বিতীয়, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ

উপনিষদ্ ব্রহ্মের বা আমাদের উপাস্যের বর্ণনা নানাভাবে নানাস্থানে করিয়াছেন ; এস্থলে উপনিষদের একটি উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে—

"স বিশ্বকৃদ্‌বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ কালকালোগুণী সর্ব্ববিদ্যঃ
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ "

তিনি বিশ্বকর্ত্ত, বিশ্ববেত্তা, সকল আত্মার স্রষ্ট, প্রজ্ঞাবান্, কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ তিনি জড় কি জীব তাবতের পালক, সর্ব্বগুণের মহেশ্বর এবং সংসারের স্থিতি, বন্ধ ও মোক্ষের হেতু।

উপাস্তে কর্ত্তৃত্ব, পালকত্ব, বিধাতৃত্ব প্রভৃতির সঙ্গে ন্যায়পরায়ণত, শুদ্ধতা, প্রেমশীলত, ও মঙ্গলভাবের সমাবেশ থাকিলেই, তাঁহার উপাসকের জীবন সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, প্রেমে, পবিত্রতায় পূর্ণ হইতে পারে জনসমাজে উপাস্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অপরিপক্বতাতে কত ন উৎপাত উপদ্রব ঘটিয়াছে. যতই উপাস্য সম্বন্ধে জ্ঞান সমুন্নত হইতেছে, ততই সমাজমধ্যে সাধুভাবের আবির্ভাব, লোকহিতৈষিতা, পবিত্রতার সমাদর এবং মানবে মানবে সদ্ভাব ও প্রীতির সম্বন্ধ প্রস্ফুটিত হইতেছে রাজনিয়মাদিতে উদারত এবং শাসনকার্য্যে প্রীতি ও ন্যায়ের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে উপাস্য সম্বন্ধে জ্ঞানের হীনতা হইতেই সমাজমধ্যে নান অনাচার ও অত্যাচারের অভ্যুদয় ও প্রাধান্য ঘটিয় থাকে ব্রাহ্মসমাজে উপাস্যের জ্ঞানের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধিতে জনসমাজ আরো কত উন্নত হইবে, কত শোভনভাবযুক্ত হইবে তাহা কে জানে? ইহাতে আমরা মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধিরই বিবিধপ্রকাশ অনুভব করিতেছি।

# সাধনের অধিকারী

মানবের জন্য যে মহাসাধন বা ব্রহ্মোপাসনার বিধি সমাগত হইয়াছে যাহা পাইয়া শুধু ব্রাহ্মসমাজ নহে, কিন্তু সমগ্র জনসমাজই বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন— সে সাধনের অধিকারী কে? সাধনের, ব্রহ্মপূজার বা অভীষ্ট দেবতার পূজার অধিকার কাহার আছে বা নাই, এ প্রশ্নের বিচারে জনসমাজে নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। কোথাও কোথাও প্রাচীন সমাজ সর্ব্বসাধারণকে এই অধিকার প্রদান করেন নাই ব্রাহ্মসমাজ এবিষয়ে অতি উদার মতই পোষণ করেন আর তা না করিলেই নয় ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিয়াছেন, "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার" এরূপ উদার বার্ত্তা ঘোষণা না করিলেই চলে না কারণ, প্রত্যেক আত্মাকে যখন জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য আদি সম্পদে সম্পদবান্ হইতে হইবে, তাহাকে যখন সর্ব্ববিধ বন্ধনহইতে মুক্ত হইয়া, সত্য, সুন্দর, মঙ্গলময়, আনন্দময়, পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হইতে হইবে, তাহাই যখন প্রত্যেক আত্মার জন্য পরমগতি— চরম পরিণতি, আর যখন ব্রহ্মোপাসনারূপ মহাসাধন হইতেই আত্মায় সমুচ্চ অবস্থার সমাগম হইবে, এবং

তাহাই যখন তাহার একমাত্র মহ সম্পদ্ লাভের উপায়, এবং তাহাই যখন মানবকে সর্ব্বাংশে পবিত্রত ও মহত্ত্ব প্রদান করিবে, তখন কোন কারণই এমন হইতে পারে না, যে জন্য মানবের এই সহজাত অধিকার হইতে সে বঞ্চিত হইতে পারে এতটা স্পর্দ্ধাই ব কাহার থাকিতে পারে, যে লোকের এই সম্যক্ কল্যাণলাভের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য সাহস করে ব চেষ্টা করে। ঈশ্বরের হইবার এবং তাঁহার অনুগত হইয়া কল্যাণ লাভের অধিকার মুক্তি ও স্বাধীনত লাভের অধিকার, পরমপ্রভু পরমেশ্বরহইতে সকলের জন্যই আসে ব আছে। সুতরাং কাহারও জন্য সে মহা অধিকার নাই এমন প্রসঙ্গই উপস্থিত হইতে পারে না তাই ব্রাহ্মসমাজ সাধন বা ব্রহ্মোপাসন সম্বন্ধে সকলের সমান অধিকারের বার্ত্তাই ঘোষণা করিয়াছেন

আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাগত তারতম্যে চেষ্টার আধিক্য বা অল্পতার তারতম্যে, মানবে মানবে পার্থক্য আছে ও থাকিবে চেষ্টার পুরস্কারলাভে কেহই বঞ্চিত হইবে না এ সব কারণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অবস্থাগত প্রভেদ আছে ও থাকিবে এবং এ সব কারণে লোকের গণনায় কেহ উচ্চ অধিকারী কেহ বা নিম্নাধিকারী বলিয়াও গণ্য হইতে

পাবে কিন্তু উপাসনায় অধিকাব কাহাবও আছে বা কাহারও নাই, এ প্রশ্নেব উত্থানই সম্ভবপব নহে। এ প্রশ্ন উপস্থিতই হইতে পাবে ন

সাধাবণতঃ লোকে নানা বিদ্যায় বিদ্বান্ ব অপরাপব অনেক বিষয়ে সুযোগপ্রাপ্তকেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী বলিয় মনে করিয়া থাকে এ বিষয়ে আমাদের সংগীতে বরং ইহাব বিপবীত কথাই আছে। সংগীতে আছে—

"প্রখব বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিবে,
তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু "

প্রখর বুদ্ধি ব্যক্তিই বরং ফিবিয়া আসিতে বাধ্য হয় যাহাব জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাব গর্ব্ব আছে—তাহাকে বরং ফিরিয়াই আসিতে হয় কিন্তু যে অকিঞ্চন, বিনীত, একান্ত কাতব, ব্যাকুল ও আপনাব দীনতায় বিনম্র, সে ব্যক্তিই সেই পরম সম্পদ্ সহজে পায় সেই প্রভু পরমেশ্বরেব পূজার অধিকার সহজে লাভ কবে এ বিষয়ে উপনিষদেব একটি উক্তি বিশেষ ভাবে বিবেচনাযোগ্য, উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয় ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ "

অর্থাৎ এই পরমাত্মাকে বেদাধ্যয়ন বা মেধা বা বহু শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে —উপনিষদের উক্তিদ্বারাও জানা যাইতেছে যে, বিদ্যা, শাস্ত্রজ্ঞান মেধা বা বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি তাঁহাকে পাইবার উপায় নহে যে সাধক প্রার্থনাপরায়ণ, যে তাঁহার জন্য ব্যাকুল, সেই তাঁহাকে পায় সুতরাং সাধনব্রত হইতে বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তেমন নাই। আকুলতা, অকিঞ্চনতা, বিনম্রভাব ও দৈন্য প্রভৃতিই এ পথের সহায় উক্ত ভাবাপন্নগণই এ সাধনকার্য্যে বিশেষ অধিকারী তাঁহারাই এ সাধনে অগ্রসর হইয়া, কৃতার্থ হইবার সুযোগ বেশী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন

ব্রহ্মোপাসনারূপ মহাসাধনে যদি কেহ অনধিকারী থাকে, তবে যে আত্মকল্যাণের প্রতি অমনোযোগী, যে আত্মহিত চাহে না, যে বিষয়মোহে অন্ধ, বিষয়াসক্ত ও অলস, উদাসীন, সেই এই মহা অধিকার হইতে আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিয়া অনধিকারী হয় তাহার যখন শুভ বুদ্ধির উদয় হয়, তখনই সে প্রত্যেকের জন্য সহজাত অধিকার ফিরিয়া প্রাপ্ত হয় এ অধিকার হইতে বাহিরের কেহই কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারে না এ মহাধিকার

হইতে সেই ব্যক্তিই বঞ্চিত হয়, যে পাপের সহিত সন্ধি করিয়া চলে পাপ এজন্যই মানবের মহা শত্রু পাপই তাহাকে পরমাশ্রয় কল্যাণবিধাতা অনন্ত কালের সহায় ও সঙ্গী, আনন্দময় হইতে দূরে রাখে, তাঁহার সহিত আত্মার যে অপরিহার্য্য, ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ আছে, তাহা হইতে বঞ্চিত করে তাঁহাকে লাভের জন্য, তাঁহার হইবার জন্য, মানবের যাহা কিছু করিবার থাকে, তাহাও করিতে দেয় না

পাপ তাহারই নাম, যাহা শুদ্ধস্বভাব পরমেশ্বর হইতে মানবকে দূরে লইয়া যায় পাপের অনেক সংজ্ঞা আছে ও হইতে পারে মিথ্যাচরণ, চৌর্য্য, হিংসা প্রভৃতি অনেক কার্য্যই পাপ নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে, এ সব যে পাপ, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু, তাহাই সাংঘাতিক পাপ বলিয়া গণ্য, যাহা মানবকে ঈশ্বরবিমুখ করে, তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখে তাঁহা হইতে দূরে লইয়া যায় ঈশ্বর শুদ্ধম্ তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন করিতে হইলে—শুদ্ধতাকেই বরণ করিতে হয় অশুদ্ধ হইয়—অশুদ্ধ কার্য্যে আপনাকে রত রাখিয়া, কেহই তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারে না এজন্যই পাপ অতি ভীষণ—অতি মারাত্মক তাহার

মতন মানবের বৈরী আর কি আছে? উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে :

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ।"

দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত মানস ব্যক্তি জ্ঞানদ্বারাও ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। উপনিষদ্ নানা ভাবেই একথা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ক্ষীণদোষ নির্ম্মল চিত্ত ব্যক্তিগণই তাঁহাকে দর্শন করেন। উপনিষদের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে :—

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"

অর্থাৎ জ্ঞান শুদ্ধিদ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। এইরূপ বহু উক্তিদ্বারা এবং সহজ বুদ্ধির বিধানদ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, শুদ্ধ সুন্দর যিনি, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণরূপ পাপের সহিত যুক্ত হইয়া, বা পাপাচরণশীল হইয়া, কেহই তাঁহাকে পাইতে পারে না বা তাঁহার হইতে পারে না। মানব তাঁহার সহিত জ্ঞাতসারে যে যোগ লাভ করিবার অধিকারী, সে অধিকারও সে ব্যক্তি পায় না।

পাপেরও যেন প্রকাব ভেদ আছে এমন কোন কোন পাপ আছে, যাহা ঝড়েব ন্যায় মানবেব উপব আপতিত হইয়া, তাহাকে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও অধিকাব করিয়া থাকে, অভিভূত করিয়া থাকে দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিরা তাহার গতির প্রতিরোধ করিতে পারে না সে আসিয়া বলপূর্ব্বক মানবকে অধিকার কবিয়া থাকে গীতাতেও এ ভাবের কথা আছে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ঃ

"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ "

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা কবিলেন, "পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও কেহ যেন তাহাকে অভিভূত করিয়া পাপে লিপ্ত করে অতএব পুরুষ কাহাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পাপাচরণ কবিয় থাকে ? এ প্রশ্নেব উত্তবে কৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ—

কাম এষ ক্রোধ এষ বজোগুণসমুদ্ভবঃ
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্

পাপ যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোককে অভিভূত করিয়া থাকে, পাপে লিপ্ত করে, তাহাতে সন্দেহ নাই এই শ্রেণীর লোক যখন পাপপ্রভাবহইতে মুক্ত হয় এবং আর পাপে পড়িবে না বলিয় সঙ্কল্প কবে, তখন সে তাঁহার সাধনের অধিকার নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয় কিন্তু অন্য

প্রকারের পাপও আছে, যাহার সহিত মানুষ সন্ধি করিয়া চলে এবং যে পাপের সহিত ইচ্ছা করিয়াই যুক্ত হয় যাহা বাহিরের অতি মোটা পাপ, তাহাকে মানুষ ইচ্ছা করিলেই পরিহার করিতে পারে কিন্তু মানুষ যখন তাহাও করে না, তাহার সহিত ভাব করিয়াই চলে —ভাবিয় চিন্তিয়া, সাংসারিক প্রয়োজন সাধনের জন্য, অথবা সমাজ মধ্যে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের আশায়, অথবা মানহানি ব স্বার্থহানির ভয়ে পাপকে বরণ করে, তখন সেই শ্রেণীর লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণপ্রদ অধিকারকে পরিহার করে, সে আপনি ঈশ্বরোপাসনারূপ মহাসাধন—মহাব্রত হইতে আপনাকে বঞ্চিত করে এবং সংসারে মহা দুঃখ ও দৈন্য সহিয়া, অনুশোচনার দারুণ পীড়ন সহ্য করিয়া, মর্ম্মাহত হইয়া কাল কাটায়

---

# ব্রহ্মোপাসনা—সজন ও নির্জ্জন

ব্রহ্মোপাসনারূপ মহাসাধন সজন ও নির্জ্জন ভেদে দুই প্রকারের সমবিশ্বাসী ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত, পরিবারস্থ প্রিয়জনদিগের সহিত মিলিত হইয়া, পরমাশ্রয় পরমপ্রভু পরমেশ্বরের যে পূজা, তাহাই সজন বা সমবেত উপাসনা আর একাকী নির্জ্জন প্রদেশে পরমপ্রভু পরমেশ্বরে আত্ম সমাধানপূর্ব্বক যে পূজা তাহাই নির্জ্জন সাধন বা উপাসনা উভয় প্রকার সাধনই পরস্পরে পরস্পরের অনুকূল. উভয় প্রকার সাধনই সাধকের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কোনটাকে উপেক্ষা করা যায় না কোন একটি সাধনকে পরিহার করিলে, সম্যক্ কল্যাণলাভের সম্ভাবনা থাকে না এজন্য সযত্নে উভয় প্রকারের সাধনেই সাধকের নিযুক্ত হইতে হইবে অঙ্গাঙ্গীভাবে উভয় সাধনই অবলম্বন করিতে হইবে সজন উপাসনার অনেক মহিমা—বহু গুণ তাহার সংহতিদ্বারা সর্ব্বত্রেই সুফল পাওয় যায়, এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা বা ব্যতিক্রম নাই গৃহের নানা স্থানে দূরে দূরে যদি কতকগুলি প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা যায়, তবে তাহাতে গৃহের অন্ধকার তেমন বিদূরিত হয় না বাতিগুলি নিকটে নিকটে সন্নিবিষ্ট হইলে,

তাহ উজ্জ্বল আকার ধাবণ কবে, তাহাব শক্তি বর্দ্ধিত হয় এইরূপ দেখা যায়; যদি কতকগুলি পুষ্প গৃহের মধ্যে নানা স্থানে ছড়ান ভাবে দূরে দূরে থাকে, তবে তাহাদের সৌরভ যেন তেমন অনুভবে আসে না, অনুভবযোগ্য হয় না যদি তাহারা একস্থানে সমষ্টীভূত হইয়া অবস্থিতি করে, তবে তাহার সৌরভ সহজেই অনুভূত হয় তাঁহার সুগন্ধ ঘন আকাব ধারণ কবিয়া গৃহস্থ ব্যক্তিগণকে তৃপ্ত করে, আনন্দিত করে সান্নিধ্য, সহযোগ, সর্ব্বত্রই শক্তিপ্রদ, বলবান্ সমবেত উপাসনাতে আমরা এ ব্যাপারের যাথার্থ্য প্রায়শঃ অনুভব করিয়া থাকি সমবিশ্বাসী বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমাশ্রয় পরম-প্রভুর পূজা কবিবার যে সুযোগ, তাহা সকল সময়ে মিলে না যখন মিলে তখন তাহা অতি সুফলপ্রসূই হয় এরূপ সুযোগ লাভ কবা অতি সৌভাগ্যেব কথা ধর্ম্মবন্ধুর প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থাতেই অতিশয় সজন উপাসনার সময় সে প্রয়োজনীয়তা আবও সমুজ্জ্বল আকার ধারণ করে ধর্ম্মবন্ধুগণের সমষ্টীভূত সাধকমণ্ডলীর মূল্য নির্দ্দেশ করা সহজ নহে মণ্ডলীর প্রয়োজন তখনই আরও অনুভূত হয়, যখন পরস্পরে পরস্পরের সাধনের সহায় হন। যখন তাঁহাদের মুখাবলোকনে ঈশ্বরস্মৃতি

জাগে বিস্মৃত হইয়া যে ছিল, তাহার যখন মোহ বিগত হইয়া ঈশ্বরস্মৃতি জাগিয়া উঠে, তখন তাঁহাদের সাহায্যকে অমূল্য মনে হয় তখনপ্রকৃত বন্ধুর কার্য্য তাঁহারাই করেন এজন্য বৈষ্ণবের লক্ষণ নিরূপণে এ কথাই উক্ত হইয়াছে যে, যাহার মুখদর্শনে হরির স্মৃতি প্রাণে জাগে, হরিনাম স্মরণে আসে, সেই বৈষ্ণব নানা কারণেই, বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনার বিধান অতি উপাদেয় ও মহামূল্যবান্ বিধান ইহাকে উপেক্ষা করা কখনই কাহারও পক্ষে উচিত হয় না।

একাকী বহু চেষ্টায় যে ভাব পাওয়া যায় না, সে উচ্ছ্বাস সে ভাব বন্ধুগণের মিলনে সহজে সমধিক ভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে সমবেত উপাসকগণ অজ্ঞাতসারে এই কার্য্য করিয়া থাকেন পরস্পরের ভাব পরস্পরে সংক্রামিত হইয়া, সকলকেই তাহা স্পর্শ করে, অধিকার করে সাধকের নিভৃ নিভৃ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিস্তেজ ব্যাকুলতা প্রজ্বলিত হইয়া দেখা দেয়, তাহা সাধকের পক্ষে অতি উত্তম সহায়—তাহা সাধককে ব্রহ্মোপাসনায় সফলতা দান করে তাহা উপাসককে উপাস্যের সহিত যুক্ত হইবার পক্ষে অতিশয় সহায়তা করে সজন সাধনের মহিমা ও গুণ কত তাহা বর্ণনীয় নহে।

সজন উপাসন এ প্রকারে বহুগুণসমন্বিত হইলেও, তাহাতেও অসাবধান সাধককে বিপদে পড়িতে হইতে পারে সাধক যখন অপর সাধকের ভাবাবেশে অভিভূত হন ব পার্শ্ববর্ত্তী সাধকের ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন, তখন তাঁহার মনে হইতে পারে—"আমার অবস্থা বেশ উত্তম আমাতে বেশ ভক্তির সমাগম হইয়াছে আমার অবস্থা বেশ উন্নত হইয়াছে " এ প্রকারের বিচার হীন সাধকের আত্মবিস্মৃতি অনেক সময়ে যে হয়, তাহা কল্পন নহে ইহাতে ক্ষতিও যথেষ্ট হইয়া থাকে, এজন্য সাধকের সর্ব্বদাই সাবহিত হইয়া, আত্মরক্ষায় নিযুক্ত থাকা আবশ্যক

সজন উপাসনায় অপরবিধ বিঘ্নও আছে সেটি এই যে, সকল সময় সরস সুস্থ আচার্য্যের সঙ্গ পাওয়া যায় না সরস, সুস্থ, জ্ঞানী ও ভক্ত আচার্য্য সকল সময়ে সুলভ নহে এ অভাব মণ্ডলীর পক্ষে গুরুতর অভাব, গুরুতর ক্ষতির কারণ আবার সময়ে সময়ে এরূপও ঘটে যে, বিশেষ বিশেষভাবাপন্ন—বিশেষ বিশেষ রুচি ও মতবিশিষ্ট আচার্য্য, সমবেত উপাসনাকালে স্বীয় ভাব ও রুচি ব মত দ্বারা পরিচালিত হইয়া এমন প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন, যাহ উপাসকগণের মনের প্রীতিপ্রদ নহে ও কল্যাণকরও

নহে তখন সেই উপাসকগণের পক্ষে সেরূপ আচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া, উপাসনায় যোগ দেওয়া কঠিন ত হয়ই, কল্যাণকরও হয় না সেরূপে উপাসনা করা তাহাদের পক্ষে অতি মনঃক্ষোভের কারণও হইয়া থাকে এরূপ স্থলে বেশ সহিষ্ণুতার সহিত অন্তরে প্রার্থনাপরায়ণ হইয়াই অবস্থিতি করিতে হয় সেই আচার্য্যের জন্য ও মণ্ডলীর জন্যও প্রার্থনা করিতে হয় অসহিষ্ণু হইয়া সে উপাসনাস্থল ত্যাগ করিয়া, চঞ্চলতা প্রদর্শন করা, কখনও কাহারও পক্ষে শ্রেয় নহে

একাকী নির্জ্জনে সত্য সুন্দর মঙ্গলময় পরমেশ্বরে আত্মসমাধানপূর্ব্বক তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া, সাধক মাত্রেরই পক্ষে অতি কল্যাণকর বাহিরের অন্য উদ্দীপন ও উত্তেজনাহীন হইয়া, 'আমি আর তুমি মাঝে কেহ নাই' এইভাবে অপরোক্ষ-যোগে যুক্ত হইবার জন্য সাধককে সর্ব্বদাই চেষ্টান্বিত হইতে হইবে সজন উপাসনার সুযোগ সকল সময়ে সকলের জন্য হয় না কিন্তু একাকী বিরলে সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহার পূজার সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে এ সুযোগ কাহারও পরিত্যাগ করা উচিত নহে একাকী অন্য সান্নিধ্য ও সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, যদি পরমেশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, এবং তাহাতে যদি প্রাণমন তৃপ্ত, পুলকিত, সরস ও সুস্থ

হইয়া উঠে, তাহা হইলেই সাধক নিরাপদ অবস্থা পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন যখন মানবকে অনেক সময় একাকী হইয়া যাপন করিতে হয় ও হইবে, তখন সেই একাকী হইয়া থাকিবার কালে সে যদি নিত্যসহচর, প্রতিনিয়ত আশ্রয় ও সহায় যিনি, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে পারে, তাঁহার সঙ্গ যদি তাহার পক্ষে মিষ্ট ও আরামপ্রদ হয়, তাহা হইলেই সে স্বাস্থ্য পাইয়, আনন্দে আনন্দময়ের সঙ্গে, রসস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া, ভয় উদ্বেগের অতীত ও কৃতার্থ হইতে পারে তখন, যিনি সাধকের একমাত্র চির প্রার্থনীয় ও লভনীয় তাঁহাকে পাইয়, তাঁহাতে প্রীত হইয় সাধক ধন্য হইতে পারে নিত্য নির্জ্জন উপাসনায় অভ্যস্ত হইলে, মধ্য বর্ত্তিতার আশঙ্কা আর থাকে ন সাক্ষাৎ অপরোক্ষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া, সাধক পরমগতি পাইয়া সফলকাম হইতে পারেন

সাধকের পক্ষে নির্জ্জন উপাসনার সময়েই আপনাকে জানিবার, চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ হয় দশজনের সঙ্গে, ভাবাবেশে অপরের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, আপনাকে বুঝিতে, অনেক ভ্রান্তি আসিতে পারে একাকী হইয়া যদি বুঝা যায়, প্রাণ সেই সত্য, মঙ্গল প্রভুতে নিমগ্ন হইতেছে, তাঁহাতে আরাম ও আনন্দ পাইতেছে, তবেই বুঝা যায় যে, সাধকের আশয়, আকাঙ্ক্ষা শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার

অবস্থা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য লাভের—সকল সম্পদের মূলাধার পরমপ্রভুকে পাইবার ও তাঁহাতে অনুরক্ত হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। তখন সাধকের প্রাণহইতে এই বাসনারই উদয় হয় যে, "সদা বিরলে তোমার সনে রহিব মগন ধ্যানে, রূপ হেরি জুড়াব নয়ন " এই প্রকারের অবস্থা যখন হয়—তখন সে বলিতে পারে—"সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে, কুসুম করে গন্ধ দান, মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী " এই প্রকারে একাকী অন্যনিরপেক্ষ হইয়া, ব্রহ্মধ্যানে, ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মানন্দরস পানে যখন সাধক নিযুক্ত থাকিতে পারেন, তখনই তাঁহাতে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হয়—তখনই সাধক ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া ও ঐশ্বরিকপ্রকৃতি পাইয়া, জীবন ও জন্মের সার্থকতা লাভ করেন এজন্য সাধক যেমন সুযোগ পাইলেই সমবিশ্বাসী ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মসাধনে রত হইবেন, তেমনি প্রাণের সহজ অনুরাগে অনুরক্ত হইয়া, সত্য সুন্দর মঙ্গলময় ও আনন্দময়ে ডুবিয়া যাইবার প্রয়াসে, তাঁহার পূজায় একাকী নিযুক্ত থাকিবেন। এই দুই প্রকারের, দুই ভাবের পূজাই সাধকের জন্য একান্ত আবশ্যক, সর্ব্বদাই অবলম্বনীয়

## উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা

উপাসনারূপ মহাসাধনে প্রবৃত্ত হইবাব যোগ্যতা কিরূপ থাকা আবশ্যক এবং কিরূপ জ্ঞান, কিরূপ বিশ্বাস থাকিলে, অনন্তমঙ্গল শুদ্ধ নিরবযব পরমেশ্বরেব পূজায় প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়, এ বিষয়েও আমাদের সংস্কাব ও ধারণা উপযুক্ত ও সুস্থ হওয়া আবশ্যক অনেকেব কথাব ভাবে এ বিষয়ে কিছু খট্‌কা লাগে তাঁহাদেব কথাব ভাব এই যে, ঈশ্বরকে প্রথমে দেখিতে হইবে, তৎপরে তাঁহাব পূজা আবম্ভ হইবে না দেখিলে পূজা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কথাটি প্রণিধানযোগ্য। যাঁহার পূজা কবিতে যাইতেছি, তাঁহাকে দেখিবাব মত আমাব কি আয়োজন আছে? আমি এমন কি কবিয়াছি বা কবিতে পাবিয়াছি, যাহাদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পাবি? তাঁহাব পূজাই যখন আমাব সাধন, তাহাই যখন আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণলাভের উপায়; সেই মহদুপায়রূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইবাব পূর্ব্বে আমাতে এমন কি ক্ষমত আসিতে পাবে, যাহাদ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ কবিতে পারি? তাঁহাব পূজারূপ সাধনদ্বারাই যখন তাঁহাকে জান, পাওয়া প্রভৃতি সম্পদ্ পাওয়া যায়, তখন সেই সাধনের পূর্ব্বে কিরূপে তাঁহাকে দেখা যাইবে?

এ সম্বন্ধে আরও প্রণিধান করিবার বিষয় আছে আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সাহায্যেই বাহিরের বস্তুসকলের জ্ঞান (যদি তাহ লাভের সম্ভাবনা থাকে) লাভ করিতে পারি। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শরূপ জ্ঞান সবই আমাদিগকে ঐ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাইতে হয় বাহিরের বস্তু সম্বন্ধে যেমন পাঁচ প্রকারের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা জ্ঞানলাভ করি, তেমনি অন্তর গ্রাহ্য বিষয়েও ঐ পাঁচ প্রকারের জ্ঞান লাভের জন্যই সাধারণতঃ আমরা ব্যস্ত হই তাই আমরা ঈশ্বরের দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষ করি কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখি না, আমাদের অন্তরে ঐ পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে কি না, এবং ঐ পাঁচ প্রকারেই তাহার জ্ঞান বা পরিচয় পাওয় যায় কি না সে সম্ভাবনা আছে কি না তাহার পরে বুঝিতে হইবে, পাঁচ প্রকারে যে জ্ঞান লাভের কথা আছে, ঈশ্বরসম্বন্ধে তাহা না করিয়া, একমাত্র দর্শনজ্ঞান লাভকে কেন প্রাধান্য প্রদান করা হয় যদি বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ পাঁচ প্রকার জ্ঞানের ন্যায় ঈশ্বরজ্ঞানেরও পাঁচ প্রকারেই পরিচয় হয়—তবে অন্যান্য ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানকেও সেই হিসাবেই গণনা করিতে হইবে আরও ভাবিতে

হইবে এবং মীমাংসা করিতে হইবে যে—নিরবয়ব—চিন্ময় পরমেশ্বরের দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ ও স্পর্শাদি সম্ভবপর কি না। এ বিষয়ে অতিশয় মতভেদ আছে উপনিষদাদিতেও এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাবাত্মক কথা ব্যক্ত হইয়াছে

উপনিষদ্ কোথাও বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জ্ঞেয়, তিনিই জানিবার উপযুক্ত, তিনি ভিন্ন বেদিতব্য আর কিছুই নাই। আবার কোথাও বলিয়াছেন তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি অরূপ, তাঁহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না, কিন্তু তাঁহাকে জানিয়াই আত্মা ধন্য হয় সকল শোক দুঃখের অতীত হয়। নিম্নে এ সম্বন্ধে উপনিষদের কতিপয় উক্তি উদ্ধৃত হইল—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ"

তিনি (ব্রহ্ম) চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাঁহাকে জানি না, কিরূপে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কদাপি ভয়প্রাপ্ত হয়েন না।

তদ্ব এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতম্
শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্

হে গার্গি। এই অবিনাশী পুরুষকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন। কেহ তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন, কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং
ধ্যায়মানঃ

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না জ্ঞানশুদ্ধিদ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া, নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন

"তন্দুর্দ্দর্শং গূঢমনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্"
তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষ পশ্যতি কশ্চনৈনম্
হৃদা মনীষা মনসাভিকপ্তে য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে
ভবন্তি।'

ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না, কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বার দেখিতে পায় না হৃদয়, সংশয়-রহিত বুদ্ধি এবং মননদ্বারা তিনি প্রকাশিত হন যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহার অমর হন

'নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে "

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বার, কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হন না যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদ্বারা তিনি কিরূপে উপলব্ধ হইবেন?

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ
সমাহিতো ভূত্ব আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া, আপনাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন

"এতদ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ '

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য, তাহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ যদি মানুষ ব্রহ্মকে ইহলোকে জানিতে পারে, তবেই তার জন্ম সার্থক হয়, ইহলোকে জানিতে না পারিলে মহা বিনাশ অর্থাৎ মহা অনিষ্ট হয় .

উদ্ধৃত বাক্যসমূহ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ ব্রহ্মকে অবশ্যলভনীয় ও জ্ঞাতব্যরূপেই নির্দেশ করিয়াছেন তাঁহাকে জানিতেই হইবে, না জানিলেই নয়, অথচ তিনি বাক্য মনের অতীত চক্ষু কর্ণাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা তিনি লভ্য নহেন তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন তাঁহার রূপ দর্শনের বিষয় নহে অথচ তিনি লভনীয়, তাঁহাকেই জানিতে হইবে. তাঁহাকে জানিলেই জীবন সার্থক হয়, না জানিলে 'মহতী বিনষ্টি' জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিরাই ধ্যানযোগে তাঁহার নিষ্কল রূপ দর্শন করিতে সমর্থ উপনিষদের ঋষি একদিকে বলিতেছেন, তিনি ( ব্রহ্ম ) সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না, আবার অন্যদিকে বলিতেছেন সূক্ষ্মদর্শীরাই তাঁহাকে দর্শন করেন

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢোত্মা ন প্রকাশতে
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয় বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতেতে গূঢরূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পান না সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন এ সকল উক্তি দ্বারা সহজেই সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, তাঁহাকে জানিলেই জীবনের সার্থকতা, এবং তাঁহাকেই জানা যায় কিন্তু তিনি বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নাহন। এ চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না ইত্যাদি তিনি মনেরও গম্য নহেন কিন্তু তিনি অন্তরের ইন্দ্রিয় বিশেষের গ্রাহ্য। অন্তরের বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়াই তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বলা হইয়াছে গূঢ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই তিনি আছেন সেই যে অন্তরেন্দ্রিয়, যাহাদ্বারা তিনি লভনীয় সেই ইন্দ্রিয়ের নাম জানি না কিন্তু তাহা আছেই তাহা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা, ব্রহ্মকে জানা, তাঁহার পরিচয় পাওয়া প্রভৃতি কথা, একটা কথার কথাই হইত— একটা অমূলক কল্পনা জল্পনাই হইত তাহা ত নহে। তাঁহাকে জানা যায়, পাওয়া যায়, তাঁহার পরিচয় পাইয়া ধন্য হওয়া যায়, তাহাতেই ত জীবনের একমাত্র সার্থকতা, তাহাতেই জীবন সত্যমণ্ডি

এই অন্তরেন্দ্রিয়ের বিকাশেই ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মসাক্ষাৎ ও ব্রহ্মস্পর্শাদি হইয়া থাকে সাধন বা উপাসনার সেই ত একান্ত প্রয়োজনীয় এই সাধনে অগ্রসর ব্যক্তিই তাঁহাকে প্রাণে পাইয়া, তাঁহাকে আস্বাদন করিয়া, তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া, তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া, তাঁহার হইয়া এবং তাঁহা-কর্তৃক অধিকৃত হইয়া, ভয় উদ্বেগের অতীত হন, ধন্য হন তখন তাঁহার আর অন্য প্রার্থনীয় কিছু থাকে না, তাঁহার পক্ষে একথা সত্য হয় যে—

"এ রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ"

এই যে মহাসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহার প্রথম আয়োজন বা উপকরণ কি? তাহার যোগ্যতা কিরূপ?

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে,এই প্রশ্নের কতকটা উত্তর পাওয়া যায় "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃশ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে এই শ্রুতিবাক্যের বিশেষ ব্যাখ্যা এইরূপ, পরমাত্মার দর্শন করিবে অর্থাৎ তাঁহার এই বিশ্বকার্য্যে তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, মহিমা প্রতীতি করিবে ও সকলের প্রাণরূপে তাঁহাকে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানিবে ইত্যাদি এই ব্যাখ্যায় ব্রহ্মদর্শনের অর্থ যে কি তাহা ব্যক্ত হইয়াছে এই ভাবেই সাধককে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে জগতে

তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও মহিমাই প্রতীতি করিতে হইবে তাহা করিয়াই, তাঁহাকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াই, তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে এ বিষয়ে মহর্ষি মহাশয়ের একখানি পত্র হইতে একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহাদ্বারা পূজায় প্রবৃত্ত হইবার প্রণালীর মর্ম্ম অনেক পরিমাণে জানা যাইবে মহর্ষি মহাশয় পত্রে লিখিয়াছেন—"যেমন নবমধু-মক্ষিকা মধুপদার্থকে না জানিয়াও মধুগর্ভপুষ্পপ্রতি ধাবমান হইয়া, তাহা হইতে মধু পান করে, তদ্রূপ মন নিরতিশয় মহৎ পুরুষকে না জানিয়াও, প্রবৃত্তিগত অনুরাগসহকারে তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় আমি ইহাতে আরও এই অধিক লিখিতে চাই যে, "অনুসন্ধান করিয়া যখন তাহার দৃঢ় নিশ্চয় হয় যে তিনি আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, তখন সে তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং তাঁহাহইতে অমৃতরস পান করিতে থাকে " মহর্ষি মহাশয়ের এই মন্তব্যে ইহাই ত অনুভব করা যাইতেছে যে, না জানিয়াই যেমন স্বভাব প্রেরিত হইয়া, নবমধুকর পুষ্পে মধুর অন্বেষণে রত হয় এবং মধুর সাক্ষাৎ পাইয়া সুখী ও সফলকাম হয়, তেমনি ব্যাকুল সাধক স্বভাবতই সেই সত্যসুন্দরের দিকে ধাবিত হয় এবং না জানিয়াই ধাবিত হয় এবং তাঁহাকে পাইয়া, তাঁহাতে অমৃত রসের সন্ধান পাইয়া, অমৃত রস পান করিয়া কৃতার্থ হয়

আমাদের একটি সংগীতেও আছে—

"না বুঝে তোমারে ভালবাসে হে যে জন
সেই প্রেমিক তোমার মনের মতন"

এ বিষয়ে প্রাচীন পুরাণকারের উক্তিও প্রণিধান-যোগ্য। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে—

"অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ
ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণ মধ্যপূর্ণ যদাত্মকম্
সর্ব্বপূর্ণ স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্"

"অদৃশ্য বস্তুর চিন্তা হইতে পারে না, দৃশ্য বস্তুও বিনষ্ট হয় অতএব যোগিগণ সেই বর্ণহীন পরমব্রহ্মকে কিরূপে ধ্যান করেন? সেই চিৎস্বরূপ পরমেশ্বর উর্দ্ধে পরিপূর্ণ, অধোতে পরিপূর্ণ, মধ্যে পরিপূর্ণ, সকলই পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ঈশ্বরে চিত্তসমাধানের ইহাই লক্ষণ জানিবে"

পূর্ব্বোক্তরূপ আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাই অনুভব করিতেছি,—এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছি যে, সাধকের সাধনে—উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ করিতে হইবে—যাহাদ্বারা তিনি জানিবেন, পরমারাধ্য পরমেশ্বর নিত্য অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান উর্দ্ধ, অধো, সম্মুখ, পশ্চাৎ, বাম, দক্ষিণ সর্ব্বত্রেই

তিনি পরিপূর্ণ করিয়া আছেন তিনি আমার অন্তবদর্শী—আমাব অবস্থা তিনি জানেন, আমাব আকাঙ্ক্ষা ও আবেদন, নিবেদন তিনি সর্ব্বদাই অবগত হয়েন আমি যখন তাঁহাকে যাহা কিছু নিবেদন করি, তখনই তাহা তাঁহাব গোচবীভূত হয় আরও তাহার জ্ঞান আবশ্যক তিনি সাধকেব কল্যাণই ইচ্ছা করেন, সাধকেব দুঃখ দারিদ্র্য, দুর্গতি ও সর্ব্বপ্রকাবের অভাব দূব করিয়া তাহাকে সুন্দর, সুস্থ ও সমৃদ্ধ করিয়া, সর্ব্বপ্রকাবে সম্পদ্-বান্ করিবার শুভ অভিপ্রায় তাহাতে আছে এই প্রকারের জ্ঞান লইয়া বিশ্বাস লইয়াই সাধককে সাধনায় রত হইতে হইবে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মকৃপার উপরেই তাঁহার নির্ভর থাকিবে তিনিই সাধককে সর্ব্বপ্রকাবেব সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহাব লক্ষ্যে লইয়া যাইবেন অন্ধকারের পরপারে লইযা গিয়া, তাহার জন্ম ও জীবনকে সার্থক করিবেন

এই প্রকারের বিশ্বাস ও জ্ঞান পাইলেই সাধকের সাধন আরম্ভ হইতে পাবে সাধক একান্ত ব্যাকুলভাবে প্রার্থনাপরায়ণ হইয়া, প্রভু পরমেশ্বরের প্রকাশ অনুভব করিবার জন্যই অপেক্ষা করিবেন দর্শন করিয়া, পূজায় প্রবৃত্ত হইতে পাবা, খুবই সৌভাগ্যের কথা কিন্তু সাধক

প্রথমেই এমন কি সাধন করিতে পারেন, এমন কি তাঁহার শক্তি থাকে, যাহাদ্বারা তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন ? দর্শনার্থী হইয়াই সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে কৃপাময়ের কৃপায় তখনই তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইতে পারে। যদি সে আশা তখনই পূর্ণ না ও হয়, তথাপি তাঁহাকে সাধনে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে কারণ, তাহা ভিন্ন সাধকের আর করিবার কি আছে ? এইভাবে একান্ত আশান্বিত অন্তরে, একান্ত ব্যাকুলতার সহিত বিনম্র ভাবে অকিঞ্চন হইয়া, আপনার দীনতা ও হীনতা অনুভব করিয়াই, তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাহাতে সেই নবমধুমক্ষিকা যেমন পুষ্পের মধুর সাক্ষাৎ পাইয়া সফলকাম হয়, সাধকও তেমনি সফলকাম হইয়া ধন্য হইবেন

# সাধনের বাহ্য উপকরণ

সাধককে বাহিরের কিরূপ আয়োজন লইয়া বা কিরূপ অনুকূল অবস্থায় গিয়া, সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সে কথা এখানে উপনিষদের ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতেছে

> "সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুক
> বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ
> মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে,
> গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ ।"

কঙ্করশূন্য, তপ্ত বালুকা বর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে, উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে, প্রতিবাদীর অনভিমুখে এবং সুন্দর বায়ুসেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্ম সমাধান করিবে

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ।"

বক্ষঃ গ্রীব ও শিরোদেশ উন্নত করত সমভাবে শরীর স্থাপন করিয়া, মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল হৃদয়েতে সন্নিবেশপূর্ব্বক সংসারার্ণবের ভয়াবহ স্রোত সকলকে ব্রহ্মস্বরূপ ভেলকের দ্বারা অতিক্রম করিবে

কিরূপ স্থানে এবং কি প্রকারে উপবেশন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহার সুন্দর বর্ণন উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত হইল ইহাই হইল সুব্যবস্থা, অনুকূল ব্যবস্থা। কিন্তু সকল সময়েই যে সাধক উক্তপ্রকারের সুব্যবস্থার সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইবেন, এমন মনে হয় না যদি সেরূপ সুন্দর স্থানাদির প্রাপ্তি না হয় যদি উক্ত প্রকারের অনুকূল অবস্থায় অবস্থিতি করিবার সুযোগ না প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে কি সাধক সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন না? এমন হইলে তাঁহার পক্ষে সাধন সর্ব্বাবস্থায় অবলম্বনীয় হইবে না, হইতে পারে না কিন্তু সাধন সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই অবলম্বন করিতেই হইবে সুতরাং নিতান্ত বিপদ্ বা সঙ্কটের অবস্থায় পতিত না হইলে, যখন যেরূপ স্থানে, যেরূপ অবস্থায় সাধক থাকিবেন, সেইরূপ স্থানে, সেই অবস্থাতেই তিনি সাধনে—পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন নিত্য যেমন শরীর রক্ষার জন্য অন্ন পানীয় গ্রহণ করিতেই হয়, উপাসনারূপ সাধনও তেমনি নিত্যই অবলম্বনীয় হইবে তাহার অন্যথা করিলে অতি অকল্যাণকর অবস্থায় যাইতে হইবে তাহা কখনই সুবুদ্ধির কার্য্য নহে পূজার আসন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বক্তব্য যদিও নানাদেশে, নানা সম্প্রদায়ে সাধকের জন্য

নানা প্রকারের আসনের ব্যবস্থা আছে, তাহা হইলেও আসন সম্বন্ধে ইহাই বিবেচ্য যে, যে আসনে অধিক সময় শান্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে পারা যায়, তাহাই অবলম্বনীয়। মুসলমান সাধকগণ দাঁড়াইয়াও সাধন করেন, খৃষ্টীয় সাধকগণ আনতজানু হইয়া সাধন করেন। উক্ত প্রকারের আসনের ব্যবস্থায়, সাধকের দীনভাব, বিনম্রতাদি বেশ সহজেই প্রাণে আসিতে পারে এবং তাহা সাধকের জন্য খুবই অনুকূল। কিন্তু অনেকক্ষণব্যাপী সাধনে প্রবৃত্ত থাকিতে হইলে, তাহা হয়ত চিত্তবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া বা নতজানু হইয়া অবস্থিতি করা তেমন সুখকর নহে। বাহিরের এরূপ অসুবিধাকে সাধনের সঙ্গী করিয়া লওয়া, তেমন সুযুক্তি সঙ্গত নহে, সুসঙ্গতও নহে। অল্পকালব্যাপী পূজায় বা উপাসনাতেই উক্ত প্রকারের ব্যবস্থা সুসঙ্গত ও অনুকূল হইতে পারে। দীর্ঘকালব্যাপী সাধনের জন্য অন্য প্রকারের আসনই অবলম্বনীয়। এ বিষয়ে মনে হয়, ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তিকে যেরূপ আসনে উপবিষ্ট দেখা যায়, দীর্ঘকালব্যাপী সাধনে প্রবৃত্ত সাধকের জন্য সেই প্রকারের আসনই প্রশস্ত।

সাধককে সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দীর্ঘকাল শান্ত-ভাবে আসনে অবস্থিতি করিবার জন্য অভ্যাস করিতে

হইবে উপাসনা কালে যদি বারংবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, নড়্‌তে চড়্‌তে হয়, তবে তাহাতে সাধনের সমূহ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে শান্ত হইয়া স্থির হইয়া, ধীরভাবে উপবিষ্ট হইয়া থাকিবার অভ্যাস সাধককে করিতেই হয়

সাধনে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে বাহ্য অনুকূল উপকরণ যদি পাওয়া যায়, তাহাতে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে সহায়তা হইতে পারে কিন্তু বাহ্য বিষয়ের প্রতি বেশী নির্ভর করা ভাল নহে। কারণ, তাহা সব সময় পাওয়া যায় না, আবার তাহা না জুটিলে উপাসনা হইবে না,এরূপ সংস্কারাপন্ন হওয়াও ভাল নহে। বরং তাহাতে ক্ষতিরই কারণ হয় মন যদি বাহ্য উপকরণেই আবদ্ধ থাকে,তবে ত অন্তরে ন্দ্রিয়ের সংযমাদির সুযোগ হইবে না। অন্তরেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, অনন্যমনা হইয়াই সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে চঞ্চল মন লইয়া কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না অন্যমনস্কভাবে যদি পথ চলিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, এমন যে সহজ অভ্যস্ত কার্য্য, তাহাতেও সফলকাম হওয়া যায় না, পড়িয়া গিয়া কষ্ট পাইতে হয় তখন উপাসনারূপ মহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে কতটা মনস্থৈর্য্যের প্রয়োজন, কতটা অচঞ্চলভাবে থাকা আবশ্যক, তাহা আর অধিক করিয়া

বলিতে হইবে না। এ জন্য নিরুদ্বেগে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, সমাহিতচিত্তেই উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

উপাসনারূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে সাধূক্তিপাঠ ও সাধুজীবনীপাঠ অতি উপাদেয় অনুকূল উপায়। তাহা মনের নিদ্রিত সাধু আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া দেয়, আদর্শ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করে। প্রভু পরমেশ্বরের সহবাসলাভের জন্য মনকে ব্যগ্র করিয়া তুলে। ক্ষুধাহীনের, আকুলতাহীনের প্রাণে ব্রহ্মলাভের জন্য ক্ষুধা ও আকুলতাকে প্রবল করিয়া তুলে। সুতরাং সাধু উক্তি ও সাধুজীবনী উপাসনার পূর্ব্বে পাঠ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। সাধুপ্রসঙ্গ সম্বন্ধেও সেই কথা। তাহা সাধকের নিত্য সহায় এবং তাহা সর্ব্বদাই অবলম্বনীয়। কিন্তু উপাসনার উদ্বোধনের জন্য অযথা সাধু মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হওয়া, তাহাতে অতিশয় নির্ভর করা বা সাধুর পদধূলি গ্রহণ প্রভৃতি বাহ্য উপায়ের প্রয়োজনীয়তা বেশী নাই। উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মকৃপার ভরসা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাই আমাদের সর্ব্বকালের সর্ব্বাবস্থার একান্ত সহায়। উপাসনাকালে সাধুর প্রসাদার্থী হইয়া সাধুর নাম বার বার কীর্ত্তনও বেশী আবশ্যক নহে। শুধু "আমি আর তুমি মাঝে কেহ নাই"

এই ভাব লইয়াই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে এ বিষয়ে মহর্ষি মহাশয়ের একখানি পত্র হইতে একটু উদ্ধৃত করা গেল পত্রখানি পরলোকগত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে লিখিত হইয়াছিল পত্রের একাংশ এইরূপ —"আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ, তাহা স্বাভাবিক যোগ এবং ঋষিদিগের আত্মা অবধি আমাদের প্রত্যেকের আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় এই আত্মপ্রত্যয়ের স্থানে কি এখন সাধুপদে পড়িয়া না থাকিলে, সাধুর পদধূলি অঙ্গে না মাখিলে এবং অন্যকর্তৃক শক্তি সঞ্চারিত না হইলে, মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইবে না, এই প্রত্যয়কে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে ? এই প্রত্যয়কে যদি হৃদয়ে স্থান দিতে হয়, তবে গায়ত্রী মন্ত্রের মূল্য থাকে না, "হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তঃ" অর্থাৎ হৃদ্গত সংশয়রহিত বুদ্ধিযোগে মনন করিলে, ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, এই ঋষিবাক্য মিথ্যা হয় এবং আধ্যাত্মিক-যোগের শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্মের মূল বিশ্বাস বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যয় হইয়া যায় "• ইহাদ্বারা সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে অনুকূল উপায় সম্বন্ধে মহর্ষি মহাশয়ের অভিপ্রায় জানা যাইতেছে আত্মা স্বাভাবিকভাবে সহজে পরমাত্মার উপরে নির্ভরশীল হইয়াই তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইবে অন্য নিরপেক্ষ হইয়া, একমাত্র তাঁহারই করুণায় নির্ভর করিয়া,

উপাসন য় প্রবৃত্ত হইবে,ইহ তাহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে,সর্ব্বা বস্থাতেই অবলম্বনীয় বাহিবের অবলম্বনের দিকে বেশী মন দিলে অন্তবেব অবলম্বনের দিকে তেমন মন থাকিবে না বিনয়, দীনত, অকিঞ্চনতা প্রভৃতিই অন্তরে সঞ্চয় কবিতে হইবে তাহা প্রাণে আসিলেই সমধিক ক্ষুধ ও তৃষ্ণাব উদয় হইয়া, সাধককে উপসনায় প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে সবিশেষ সাহায্য কবিবে

ব্রহ্মসংগীত সাধকের একটি পবমোত্তম সহায় ইহ ব'হিবেব হইলেও, সংগী৩, স'ধকেব অন্তরে প্র'বিষ্ট হইব'র পক্ষে এবং সত্য সুন্দরের দিকে যাইবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল আতিশয্য এ বিষয়েও ভাল নহে কারণ, তাহাতে মিষ্টবসের জন্য লোলুপ ব্যক্তি যেমন মিষ্টরসের আস্বাদনেব জন্যই ব্যস্ত হয়, তেমনি সাধক আসল বস্তু অপেক্ষা সংগীতেই বেশী আকৃষ্ট হইতে পাবেন

সাধকের আহাব বিহাবাদি কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে গীতার উপদেশই সমীচীন গীতায় উক্ত হইয়াছে

"নাত্যশ্নতস্তু যোগঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন যিনি অধিক ভোজন করেন কিম্বা যিনি কিছুই ভোজন করেন না এবং যিনি অতিশয় নিদ্রাশীল অথবা যিনি অতিশয় জাগরণশীল, ইঁহাদের মধ্যে কাহারও যোগানুষ্ঠানের সম্ভাবনা হয় না যিনি আহার, গতি, কার্য্যচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিতরূপে পরিমিতরূপে করেন, তাঁহারই দুঃখহানিকর যোগ সিদ্ধ হয়

আহার নিদ্রা প্রভৃতি আমাদের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই সমাগত হয় ইহা যে আমরা অভ্যাস দ্বারা বা শিক্ষা দ্বারা উপার্জ্জন করি, তাহা নহে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই আহারে প্রবৃত্ত হয় নিদ্রাও আপনা হইতেই তাহাকে অধিকার করে সুতরাং এ সব আমাদের কল্যাণ বিধাতারই ব্যবস্থা এজন্য এ সকলের একান্ত পরিহার কখনই তাঁহার অভিপ্রেত নহে মানুষ যে আহার ও নিদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করে বা অতিশয় হ্রাস করে,তাহার কোনটিই ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে এ সব বিষয়ে নিয়মিত ও পরিমিত অভ্যাসই শ্রেয়ঃ। সংক্ষেপে বলিতে হয়, যাহা উপাসনার প্রতিকূল তাহাই পরিত্যাজ্য আর যাহা উপাসনার অনুকূল তাহাই গ্রহণীয় ভোগস্পৃহা ও আলস্য সর্ব্বাবস্থাতেই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য যাহাতে শরীর স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল হইবার উপযুক্ত হয়—যাহাতে শরীর সহজে কর্ম্মশীল হয়,

তাহাই অবলম্বনীয় অতিভোজন অনেক রোগের মূল এবং সাধনার্থীর সাধন-পথের প্রবল বাধা, তাহা কখনই করণীয় নহে অতিনিদ্রা ত অলসেরই অবলম্বন তাহা সকল কার্য্যেরই অন্তরায়, সুতরাং অতিনিদ্রাও পরিত্যাজ্য

শরীর যাহাতে সুস্থ থাকে, সবল হয় তাহার জন্য যথাপরিমাণে ব্যায়ামসাধনও সাধনের পক্ষে অনুকূল, তাহাতে দীর্ঘকাল সাধনের উপযুক্ত শরীর পাওয়া যায় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল শরীর লইয়া কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না এ জন্য শরীরের স্বাস্থ্যের প্রতিও সাধকের বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক

স্থান, কাল, সঙ্গ, গৃহ, শরীর প্রভৃতি বাহ্য উপকরণ-যদি সাধকের অনুকূল হয়—সে হইল সোণায় সোহাগার মতন আসল কথা এই যে, চিত্তশুদ্ধি, ক্ষুধিত তৃষিত মনপ্রাণ, ব্যাকুলতা, বিনয়, দীনতা, অকিঞ্চনতা প্রভৃতিই সাধকের সাধনের পরমসহায় সর্ব্বাবস্থাতে সহায় সাধক তাহাই উপার্জ্জনপূর্ব্বক সধানে প্রবৃত্ত হইবেন সাধকের সাধনের অনুকূল রূপে যাহা বর্ণিত হইল, তাহার সমস্তই সত্যমূলক হওয়া আবশ্যক আমাদের সাধন আধ্যাত্মিক এবং সত্যমূলক সাধন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই শোভন হয়—সার্থক হয় এবং অমোঘ হয়

এ বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যই সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থায় স্মরণে রাখা আবশ্যক, অবলম্বন করা আবশ্যক এ বাক্যের মতন মহৎ বাক্য সাধকের জন্য অল্পই আছে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের সে বাক্য এই—

"সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে
নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ
সত্যহীনং তপো ব্যর্থমূষরে বপনং যথা
সত্যরূপং পরব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরং নহি "

হে সুব্রতে, সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য যে অনুষ্ঠান করে, তাহাই সফল হয়, ইহা নিশ্চয় জানিও সত্য অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই মিথ্যা অপেক্ষা আর পাপ নাই অতএব সমুদয় হৃদয়ের সহিত এক সত্যকেই আশ্রয় করিবেক সত্যহীন পূজা বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা। সত্যহীন তপ উষর ক্ষেত্রে বীজবপনের ন্যায় ব্যর্থ। পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ সত্যই পরমতপঃ সমুদায় অনুষ্ঠান সত্যমূলক, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই "

উপনিষদের উক্তি, এ বিষয়ে এইরূপ,

"সত্যান্ন প্রমদিতব্যং' সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না,
"সত্যং বদ সমূলে বা এষ পরিশুষ্যতি,
যোঽনৃতমভিবদতি "

সত্য কথা বল, যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে সে সমূলে শুষ্ক হয়।

উপরোক্ত মহাবাক্য সমুদয় সর্ব্বদা, সর্ব্বতোভাবে সাধকের একান্ত প্রণিধানের বিষয় এবং অবলম্বনীয়। সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়া আর মৃত্যুমুখে গমন করা একই কথা। এ জন্য সাধকের সমস্ত জীবন, সমগ্র ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান সত্যমূলক হইবে। ইহাই আমাদের জন্য সর্ব্বোত্তম বাক্য—সার উপদেশ।

## ব্রহ্মোপাসনা

"ব্রহ্মোপাসনাই এই সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বজনের অবলম্বনীয় ও সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণপ্রদ আধ্যাত্মিক সাধন ব্রহ্মোপাসনা যে সজন ও নির্জ্জন ভেদে দুই প্রকারের, তাহা ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই ব্রহ্মোপাসনার স্বরূপ কি, ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি, ইহা কিরূপে সাধন করিতে হইবে, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

সজন ও নির্জ্জন উপাসনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একই প্রকারের হওয়াই প্রার্থনীয় সজন বা সামাজিক উপাসনার সকল অঙ্গই সব সময়ে অবলম্বনীয় হইয়া থাকে, নির্জ্জন উপাসনা স্থান কাল ও অবস্থা বিশেষে সাধকের উপস্থিত প্রয়োজন অনুসারে অবলম্বনীয় হইয়া থাকে এ বিষয়ে সাধকের স্বাধীনতা থাকা উচিত তিনি ইচ্ছা করিলে আপনার প্রয়োজনানুসারে উপাসনার কোন কোন অঙ্গ বিশেষভাবে অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ উপাসনার সকল অঙ্গই অবলম্বনীয় ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতিতে ক্রম-বিকাশ আছে রাজর্ষি রামমোহন "ব্রহ্মোপাসনার একটি সংক্ষেপ ক্রম" নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মসমাজে এই পদ্ধতিমতে উপাসনা হইত না তখন

উপাসনায় কেবল উপনিষৎ পাঠ, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত হইত রাজর্ষি রামমোহনের উদ্ভাবিত ব্রহ্মোপাসনার ক্রম এইরূপ :—

"ওঁ তৎসৎ ১ ১ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্য
একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ২। ২ একমাত্র অদ্বিতীয়
বিশ্বব্যাপী নিত্য

এই দুয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থক্যে শ্রবণ ও চিন্তন করিবেক।"

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।"

"এই শ্রুতির পাঠ এবং ইহার অর্থচিন্তন কৃতার্থের হেতু হয় অর্থ চিন্তনের ক্রম সংস্কৃতে এবং ভাষাতে জানিবেন"

পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি মহাশয় ব্রহ্মোপাসনার যে পদ্ধতি নির্দ্দেশ করেন—তাহাতে অর্চ্চনা প্রণাম, সমাধান, ধ্যান, স্তোত্র, প্রার্থনা, স্বাধ্যায় এবং উপসংহার—এই কয়েকটি অঙ্গ আছে এই পদ্ধতি অনুসারে আদিব্রাহ্মসমাজে উপাসনা হইয়া থাকে তৎপরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ কর্তৃক সজন ব্রহ্মোপাসনার উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা প্রধানতঃ এই চারিটি অঙ্গ নির্ণীত হয় প্রার্থনান্তে শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশদানের রীতিও উপাসনার অঙ্গরূপেই নির্ণীত হইলেও, এ দুটি সর্ব্বত্র হয়ত অবলম্বিত

হইত না। পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পদ্ধতিতে আরও কিছু পরিবর্ত্তন আসিয়াছে; তবে সে সকল মুখ্য নহে। কারণ, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাহা অবলম্বিত হয় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তিকালে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত উপাসনা-পদ্ধতিই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও সাধারণতঃ সেই পদ্ধতি অনুসারেই সামাজিক উপাসনা হইয়া থাকে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি, এবং ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত পদ্ধতিতে মূলতঃ ঐক্য আছে। সকল স্থলেই আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনাকে উপাসনার মুখ্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্চ্চনা, প্রণাম, স্তোত্র প্রভৃতি সাধারণ ভাবে সর্ব্বত্রই অবলম্বিত হয়। উদ্বোধন সজন উপাসনাতেই বিশেষভাবে অবলম্বনীয়। সজন ও নির্জ্জন উপাসনায় উদ্বোধনের ক্রম অবশ্যই বিভিন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মসঙ্গীতও ব্রহ্মোপাসনার বিশেষ অঙ্গরূপেই পরিগৃহীত ও পরিগণিত হইয়াছে। নামসাধনও উপাসনার অঙ্গ। নির্জ্জন সাধনে তাহা বিশেষভাবেই অবলম্বনীয়—সজনসাধনে সঙ্কীর্ত্তনই নামসাধনের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতি—নির্দিষ্ট বাক্যে আবদ্ধ সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রাথমিক অবস্থায়, এরূপ নির্দ্দিষ্ট বাক্যে আবদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণে উপকার হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা কিন্তু সাধনে অগ্রসর ব্যক্তির পক্ষে, নিত্য একই বাক্যে আবদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণে তৃপ্তি হইবার সম্ভাবন নাই সাধককে পরমেশ্বর প্রসাদে উপাসনায় নিত্য নূতন নূতন ভাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে উপাসনায় নিত্য নূতন নূতন রসধারা প্রাণে সমাগত না হইলে যেমন উপাসনা সরস হয় না, প্রাণপ্রদ হয় না তেমনি সাধকের প্রাণে নূতন নূতন তত্ত্বেরও আবির্ভাব হয় না উপাসনার মধ্য দিয়া সাধক যে নানা তত্ত্ব, ভাব ও রসের আস্বাদন প্রাপ্ত হন, তাহা স্বাধীনভাবে অবলম্বিত পদ্ধতি দ্বারাই হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। এ ভাবের আরাধন ও ধ্যান যোগে সাধক নূতন নূতন তত্ত্ব ও ভাব পাইয়া যেমন কৃতার্থ হইয়া থাকেন, তেমনি নূতন নূতন ভাবে ব্রহ্মসত্তার স্বাদ পাইয়া, তিনি ব্রহ্মস্বরূপের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যেও মগ্ন এবং মুগ্ধ হইতে থাকেন উপাসনায় ভাষার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, জগতের পক্ষেই অতি কল্যাণপ্রদ অভিনব ব্যাপার ইহাদ্বারা সমূহকল্যাণের উৎপত্তি হইয়াছে

স্বাধীনভাবে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেই উক্তরূপে সাধকের সার্থকতা লাভের সম্ভাবনা বেশী কিন্তু এই স্বাধীনতাতেও বিপদ না আছে এমন নহে এ পথে কল্পনা আসিয়া সাধককে সত্য হইতে—বাস্তবিকতা হইতে দূরে সরাইয়া লইতে পারে ভাষার অপব্যবহারও হইতে পারে এজন্য সাধককে সর্ব্বদাই সতর্ক হইয়া—সাবহিত চিত্তে আপনাকে পরীক্ষা করিতে হইবে কল্পনা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া প্রবঞ্চিত করিতেছে কি না, সাধককে সব সময়েই সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে

**উদ্বোধন** অর্থাৎ বহির্বিষয়ে আসক্ত—ঈশ্বর-বিস্মৃত অথবা নিদ্রামগ্ন আত্মার জন্য আত্মকল্যাণের দিকে, ঈশ্বরস্মরণের দিকে এবং চেতন লাভ করিয়া—উপাসনার জন্য মনপ্রাণকে ব্যগ্র, ব্যাকুল, পিপাসু ও ক্ষুধিত করিয়া তুলিবার দিকে লইয়া যাইবার জন্য যে প্রচেষ্টা, তাহারই নাম উদ্বোধন সাধনের এই অনুষ্ঠান সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়, সকলের জন্য অবলম্বনীয় না হইতে পারে এজন্য ইহা একান্ত অনুল্লঙ্ঘনীয়—অবশ্য প্রতিপাল্য অবলম্বন নহে। সময় সময় ইহাকে পরিহার করিয়াও চলা যাইতে পারে এবং চলাও যায়

সংগীত দ্বারাই এ কার্য্যটি সমুচিতরূপে সাধিত হইতে পারে ব্রহ্মসংগীত যেমন ব্রহ্মোপাসনার উদ্বোধনের

বিশেষ সহায়, এমন সহায় আব বেশী দেখা যায় না। সাধূক্তি পাঠ এবং আচার্য্যের সবল সত্যজ্ঞানমূলক সরস বাণী সাধকের নিদ্রালু প্রাণকে জাগাইবার পক্ষে, উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে বিশেষ সহায়। সৎসঙ্গ—সমবিশ্বাসী বন্ধুগণের সম্মিলনও এ কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। এ কার্য্যেও প্রার্থনা সাধকের বিশেষ সহায়।

আত্মশ্রদ্ধা -উপাসনার এ অঙ্গ সজন নির্জ্জন উভয়বিধ সাধনেই একান্ত অবলম্বনীয়, অনতিক্রমণীয় এ বিধি। তবে সাধক কখনও কখনও একাকী উপাসনা কালে উপাসনাব এক একটি অঙ্গ অবলম্বন করিতে পারেন। তাহা হইল বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থাব বিশেষ বিধি। কিন্তু সাধারণতঃ সাধক উপাসনার এ অঙ্গকে অনতিক্রমণীয় বলিয়াই জানিবেন।

আরাধনা যে কি, তাহা গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে উপাসন কালে আচার্য্যগণকৃত আরাধনাদ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। তাহার বিশেষ লক্ষণের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজনাভাব। কিন্তু এই সর্ব্বজনপরিচিত ব্যাপারের বিশেষ ব্যাখ্যায়ও অনেকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাহাতে বিষয়ের জটিলতা বাড়ে বই কমে না। সে যাহা হউক, আরাধনা ব্যাপারটি কি তাহা মহর্ষি মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত

উপাসন-পদ্ধতির প্রার্থনাতেই বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত প্রার্থনায় আছে—"এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক অহরহঃ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য-সহবাসজনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।" মানবাত্মার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় কল্যাণকর অবস্থা ত ইহাই যে, শুদ্ধ, সুন্দর, আনন্দময় পরমেশ্বরের সহবাসে থাকিয়া ভূমানন্দ লাভ করা পরম স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করা। তাহাই যদি আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, তবে তাহা আমরা কিরূপে পাইব? কিরূপভাবে সাধনপর হইলে সেই অবস্থায় আমরা উপনীত হইতে পারিব? তাহার সাধন প্রকৃষ্ট সাধন অহরহঃ পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের চিন্তায় নিযুক্ত থাকা, তাঁহার অপার মহিমার চিন্তনে নিযুক্ত থাকা আরাধনাই সেই সাধন। তাহা পরবর্ত্তী অন্যান্য সাধনে আরও সমুজ্জ্বল ও গাঢ় হইয়া থাকে কিন্তু আরাধনাই সেই মহত্তর সম্পদ্ লাভের প্রথম সাধন। আমাদের চিত্তের নানা বিষয়ে ধাবমান হইবার যে প্রবৃত্তি আছে, তাহাকে প্রশমিত করিয়া, সত্য সুন্দরে মনকে একেবারে ডুবাইয়া দেওয়া—একেবারে তাঁহাতে অনুরক্ত

৮

করিয়া রাখা, এই আরাধনার দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে এজন্য আরাধন, সাধকের জন্য সর্ব্বাবস্থায় অবলম্বনীয় অতি কল্যাণকর অনতিক্রমণীয় সাধন

আরাধনাকে স্বরূপজ্ঞান লাভের উপায়ও বলা যাইতে পারে আরাধনাকালে যে

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি

শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"

প্রভৃতি ব্রহ্মস্বরূপের কীর্ত্তন ও আবৃত্তি হয়, যদিও ইহাতে ব্রহ্মস্বরূপের সম্যক্ ব্যক্ত হয় নাই তাঁহার স্বরূপ কত তাহা কে জানে?—যদিও ইহাতে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব বাচক, বিধাতৃত্ববাচক, পাপনাশক, চিত্তবিনোদক প্রভৃতি আরও তাঁহার স্বরূপের সমাবেশ থাকা আবশ্যক, তাহা হইলেও সেই স্বরূপের অল্পই জানা গিয়াছে মনে করিয়, যাহা বর্ত্তমানে জানা গিয়াছে এবং শুভমুহূর্ত্তে প্রাণে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব সমুদিত হইবে, তাহার চিন্তনে ও বারম্বার তাঁহার অনুধ্যানে নিযুক্ত হইতে হইবে কারণ, এ ভাবেই গূঢ় ও গুহাহিত যাহা, তাহার অর্থ অনুভূত হইয়া থাকে আমরা দেখিতে পাই, কোন গভীর অর্থব্যঞ্জক গূঢ় ভাব পূর্ণ কবিতার অর্থ যখন একবার পাঠে হৃদয়ঙ্গম হয় না, তখন বার বার বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা পাঠে

নিযুক্ত হইতে হয়—অনেকবার পাঠের পর সেই কবিতার অর্থ যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকাশিত হয়। অর্থ অনুভবে এই ভাবে সমর্থ হওয়া যায় কঠিন অঙ্ক সম্বন্ধেও ইহাই দেখা যায় যাহার তাৎপর্য্য সহসা অনুভূত হয় না, তাহার অর্থ বুঝিতে হইলে, বার বার তাহা পাঠ করিতে হয় এই ভাবে বার বার চেষ্টার পরে তাহার তাৎপর্য্য অনুভূত হইয়া থাকে

ঈশ্বরের নাম স্বপ্রকাশ হইলেও—তিনি আবার "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং," "গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং"ও বটেন তাঁহাকে অনুভব করিতে হইলেও, বারম্বার তাঁহার স্বরূপবাচক বাক্যকে পাঠ করিতে হয় বারম্বার তাঁহার শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হইতে হয় এরূপ করিতে করিতেই তাঁহার স্বরূপের যথার্থ অর্থ—যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় এ জন্য আরাধনাকালে নানা ভাবেই তাঁহার স্বরূপের চিন্তন ও শ্রবণ মনন করা উচিত

এ বিষয়ে গীতার প্রণালীও ভাল গীতায় ঈশ্বর জ্ঞানার্থী, জিজ্ঞাসুর নিকটে আপনার পরিচয় দিয়া বলিতেছেন, আমি এইরূপ, আমি ঐরূপ। সাধক যেন তাঁহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন, হাঁ, তুমি ঐরূপই বট। এইরূপে ঈশ্বর সাধকের নিকটে যাহা ব্যক্ত করেন, সাধক

যখন তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তখনই তাঁহার পরিচয় সত্যভাবে পাওয়া গিয়া থাকে। আরাধনাকালে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে সাধক যাহা বলিবেন, তাহা যাহাতে তাঁহার অনুমোদিত হয়—সত্য হয়, সেই দিকেই সাধকের লক্ষ্য থাকা উচিত। সাধক ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বলিবেন, ঈশ্বর তাহা অনুমোদন করিতেছেন, এ বোধ সাধকের থাকা আবশ্যক। আরাধনা প্রধানতঃ স্বরূপ সাধনা ও তাহা অনুভবেরই ব্যাপার। স্বরূপের পরিচয় লাভ এবং পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে অত্যন্ত ইচ্ছার উদ্রেক হওয়াই আরাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যাহাতে সেই সত্য, সুন্দর, পরমেশ্বরের সহিত নিত্য সহবাসজনিত ভূমানন্দ লাভের সুযোগ হয়, আরাধনা সেই অবস্থায় যাইবার চেষ্টারূপ সাধন। ইহাতে প্রার্থনার ভাব বেশী থাকিবে না। ইহা স্বরূপ জ্ঞানলাভের জন্য অভ্যাস যোগও বটে। স্বরূপের পরিচয় পাইয়া, স্বরূপে নিমগ্ন হওয়া এবং তাঁহাতে অনুরক্ত হওয়াই আরাধনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।

**ধ্যান**—আরাধনা যথাযথরূপে হইলে ধ্যানের অবস্থায় যাইতে আর অসুবিধায় পড়িতে হয় না। প্রাণ তখন সত্যসুন্দরে সহজেই নিমগ্ন হইয়া, তাঁহার মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য,

মহিমা প্রভৃতি সম্ভোগ করিতে সুযোগ পায় তখনই সহজে ধ্যানে নিযুক্ত হইতে পারা যায়

আরাধনা যেমন বাহিরে ব্যক্ত হয় আচার্য্যগণের আরাধনা করিবার পদ্ধতিদ্বারা যেমন তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় এবং আরাধনা শিক্ষা যেমন সহজেই হয় ধ্যানের পক্ষে সে কথা নহে

ধ্যান একান্তই আন্তরিক ব্যাপার। তাহার সাধন, প্রকার ও প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষালাভের উপায়ও অতিশয় গূঢ়। প্রকৃতরূপে ধ্যানের লক্ষণ ভাষায় ব্যক্ত হয় না, তাহা অন্তরেই অনুভব করিতে হয়

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পদ্ধতিতে ধ্যানের মন্ত্র এই

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য
ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ "

সর্ব্বলোকপ্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই পূর্ণ মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি। যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন ইহাদ্বারা ধ্যান কি ঠিক তেমন বুঝা গেল না—ধ্যানের উদ্বোধনই হইল

সাকারোপাসকগণের উপাস্য দেবতার ধ্যানের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাদ্বারা জানা যায়—উপাস্যের রূপ ও

গুণাদির চিন্তাই ধ্যান। এই দিক্ দিয়া দেখিলে আমাদের উপাস্যের ধ্যানেরও ভাব কতকটা বুঝা যাইতে পারে, অর্থাৎ আমাদের উপাস্য ব্রহ্মের স্বরূপের একান্তভাবে যে চিন্তা, তাহাই তাঁহার ধ্যান ধ্যান শব্দের যোগশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অর্থও এইরূপ, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে, ধারাবাহিকরূপে ধ্যেয়ের যে চিন্তা তাহাই ধ্যান এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত এই, তরল পদার্থ পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিতে গেলে যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারার উৎপত্তি হয়—ধ্যেয়ের চিন্তাপ্রবাহ সাধকের মনে যখন ঐপ্রকার অবিচ্ছিন্ন আকার ধারণ করে, তখনই তাহাকে উপাস্যের ধ্যান করা হইল, বলা যাইতে পারে প্রকৃত কথা এই যে, ব্রহ্মস্বরূপ-চিন্তাপ্রবাহ যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধারাবাহিকরূপে প্রবাহিত হয়, তখনই তাহা ধ্যান নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত হয়। ব্রহ্মের ধ্যান আমাদের জন্য মহা সম্পদ্ এ সম্পদ্ লাভের অধিকারী হইতে পারা আমাদের মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার আত্মার ইহা অতি উচ্চ অধিকার আরাধনাকে যেমন ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি এবং তাঁহার স্বরূপ সম্ভোগের উপায় বলা যায়, ধ্যানকে তেমনি ব্রহ্মসত্তায় নিমগ্ন হইয়া বিশেষভাবে সেই সত্ত সম্ভোগের উপায় বলা যাইতে পারে। আরাধনা, ব্রহ্মসত্তায় উপস্থিত হইবার

সোপান, ধ্যান স্বরূপে উপস্থিত হইয়া সেই ব্রহ্মসত্তাতে নিমগ্ন হইবার উপায়। আরাধনাই গাঢ় ও গভীর হইয়া মূর্ত্তিমন্ত হইলে, ধ্যানের আকার ধারণ করে। ধ্যান, ব্রহ্মসত্তাসম্ভোগ। ব্রহ্মের হইতে হইলে ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ বাক্য এই যে

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

যে যেরূপ ভাবনা করে, তার সেইরূপ সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ যে যাহা অনুক্ষণ চিন্তা করে বা ভাবনা করে, সে সেইরূপই হইয়া যায়। তন্ময় হইতে গেলে ধ্যান বা চিন্তাধারাই হইতে হয়। ধ্যানেতে তন্ময়ত্ব লাভ হয়। তজ্জন্যই ইহা ব্রহ্মের সহিত তন্ময়ত্ব লাভের উপায়। আমরা ত দেখিতে পাই—গভীর ভাবে অতিশয় মনোযোগের সহিত চিন্তারত হইলে, চিন্তনীয় বিষয়ের সহিত আমাদের তন্ময়ত্ব ঘটে। ব্রহ্মের একান্ত ভাবের চিন্তায় বা ধ্যানেও আত্মার সেই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইহাই যোগলাভেরও উপায়। প্রকৃতিতে যে কিছু ব্রহ্মবিরুদ্ধ ভাব থাকে, তাহার তিরোভাব এই ভাবেই হইতে পারে ও হইয়া থাকে। আমরা যত কিছু ব্রহ্মবিরুদ্ধ প্রকৃতি উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা এইরূপে প্রতিনিয়ত ব্রহ্মচিন্তা রূপ ব্যাপারদ্বারা বা

ধ্যানদ্বারাই অপসৃত হইতে পারে ও হইবে। সুতরাং ধ্যান আমাদের পরমসহায় পরমসাধন ইহার কাঠিন্যও অতিশয় এজন্য লোকে সহজে ধ্যানে রত হইতে চাহে না অন্যরূপ সাধন যেন কতকটা সহজ তাই সেই সব দিকেই লোকের মতি গতি সহজে হয়। ধ্যানে নিযুক্ত হওয়া সাধারণতঃ বড় একটা হইয়া উঠে না তাই, আমাদের প্রকৃতিতে ব্রহ্মবিরোধী ভাব থাকিয়াই যায় আমরা তাঁহার প্রকৃতি পাইয়া তাঁহার মত হইতে পারি না বিচ্ছেদ ত সে কারণেই আর যায় না প্রকৃতিকে ব্রহ্মানুগত করিতে হইলে, স্বভাবকে ব্রহ্মভাবাপন্ন করিতে হইলে বা আমাদিগকে ব্রহ্মের মতন হইতে হইলে, তাঁর ধ্যানেই অধিক পরিমাণে নিযুক্ত হইতে হইবে তাহাই আমাদের পরম কল্যাণকর সাধন

ধ্যানের উন্নত হইতে উন্নততম অবস্থা আছে সে সকলের নাম ধারণা, সমাধি প্রভৃতি হইয়া থাকে তাহা ঐ ধ্যানেরই প্রকার বিশেষ, উন্নত অবস্থাবিশেষ সাধক কালে সেই উন্নত অবস্থায় উন্নীত হইয়া, কৃতার্থ ও ধন্য হন—সফলকাম হইয়া সাধনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার যে ব্রহ্মযোগ তাহা প্রাপ্ত হন

প্রার্থনা—উপাসনার পদ্ধতিতে প্রার্থনাকে সমবেত উপাসনার শেষাংশে স্থাপন করা হইয়াছে। সমবেত বা সামাজিক উপাসনায় বিশেষ প্রার্থনা যাহা অবলম্বিত হইয়া থাকে, উপাসনায় তাহার একটি বিশেষ স্থান ত থাকিবেই। তাহা শেষভাগে হওয়াই সঙ্গত হইয়াছে। মানুষ চেষ্টা যত্ন করিয়া প্রথমে দেখিবে। তাহাতে যাহা হয় না, তাহা প্রার্থনাদ্বারাই হইবে। সুতরাং উপাসনার শেষভাগে প্রার্থনা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধকের জন্য প্রার্থনা কিয়ৎপরিমাণে সকল সময়েই অবলম্বনীয়। যেখানে নিজের শক্তিতে কুলায় না, সেখানেই প্রার্থনার উদয় হইয়া থাকে। যখন সাধক উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া, মনের চঞ্চলতার অধীন হইয়া পড়েন, মনের স্থিরতা সাধন করা সহজ হয় না, তখনই তিনি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এজন্য প্রার্থনা সকল সময়েই হইতে পারে। কিন্তু সামাজিক বা সমবেত উপাসনার যে একটি ক্রম বা পদ্ধতি থাকে, উপাসকের (আচার্য্যের) তাহারই অনুসরণ করা ভাল। সে সময়ে প্রার্থনা তাঁহার আন্তরিকই হইবে।

প্রার্থনা যে কি—তাহার কি ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন আছে? প্রার্থনা কে না করেন? শৈশবকাল হইতেই প্রত্যেক নরনারী—মাতা, পিতা প্রভৃতির

নিকটে চাহিতে থাকে চাওয়া—প্রার্থনা করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার গৃহের বালক বালিকারা জানে যে, গৃহে তাহাদের জন্য নানাবিধ খাদ্য ও প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত ও সংগৃহীত হইয়া থাকে মাতা পিতাও তাহা জানেন যে, সন্তানদের জন্যই বিশেষ ভাবে তাহা প্রস্তুত হইয়াছে সময়ে তাহারা তাহা পাইবে কিন্তু সন্তানেরা তখনই তাহা না পাইয়া অধীর হইয়া উঠে তাঁহাদের আর সহিষ্ণুতাতে কুলায় না তাহারা চাহিয়া চাহিয়া মাতা পিতা প্রভৃতিকে অস্থির করিয়া তোলে এই ব্যাপার হইতেও ত বুঝা যায় যে, প্রার্থনা করাটাই যেন স্বভাব।

প্রার্থনার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি তর্ক আছে তাহা থাকিলেও, লোকে যে সাধারণতঃ প্রার্থনাপরায়ণই হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই লক্ষ্যসাধন যখন নিজ শক্তিতে হইয়া উঠে না, বার বার পরাজিত হইতে হয়, অথচ লক্ষ্যে উপনীত হইতেই হইবে, প্রয়োজনীয় সম্পদ্ পাইতেই হইবে, তখন ত আপনা হইতেই প্রাণের গভীর স্থান হইতেই প্রার্থনার উদয় হয় অনেক সময় মৌখিক প্রার্থনা না হইতে পারে কিন্তু অন্তরের অন্তরের যে প্রার্থনা, তাহার উদয় হইতে বিলম্ব হয় না তাহার শিক্ষারও প্রয়োজন হয় না এজন্য পরম প্রভু পরমেশ্বরের

নিকট যে দীনাত্মা, অকিঞ্চন সাধক আত্মশক্তির সাহায্যে লভনীয় সম্পদ্ লাভ করিতে পারে না, যখন ঘোর পরীক্ষা প্রলোভন আসিয়া সাধককে আক্রমণ করে, তখন তাহাকে প্রার্থনা করিতেই হয়। প্রার্থনা আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটি গূঢ় নিয়ম। চাহিয়াই এ রাজ্যে পাইতে হয়। চাওয়াকে অকারণ বা সময়ের অযথা ব্যবহার বলিয়া উপেক্ষা করিলে ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হয়, প্রার্থনা উচ্চ-সোপানে উঠিবার অনাগত সম্পদ্ পাইবার বিশেষ উপায়। তাহা সাধক কখনই ত্যাগ করিবেন না। খুব সরল ও সহজভাবে এবং একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিতই সাধক প্রার্থনাতে প্রবৃত্ত হইবেন। আমাদের সাধারণ ও নিত্যকার প্রার্থনা এই—

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং
পাহি নিত্যম্।"

এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ অভাবমোচনের জন্য প্রত্যেক সাধকেরই বিশেষ বিশেষ প্রার্থনা থাকে ও থাকিবে।

নামসাধন—ভজন-উপাসনায় নামসাধন বিশেষ ভাবে অবলম্বিত হয় না—হইবার উপায়ও নাই। নাম

সংকীর্ত্তনদ্বারাই ভজন উপাসনা কালে এই নামসাধন সাধিত হইয়া থাকে কিন্তু ব্যক্তিগত সাধনে নাম-সাধন অতিশয় প্রয়োজনীয় সাধন ভক্তিপথের পথিকগণ নামসাধনকেই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন ভক্তিপথের পথিকগণের নিকট 'নামে রুচি জীবে দয়াই' ধর্ম্ম নামে বিশেষ ভাবে পরিগৃহীত ভক্তি সাধনার্থী এবং ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠ সাধক ও উপদেষ্টাগণ নামের মহিমা বর্ণনায় শতমুখ, সহস্রমুখ হইয়া থাকেন। নামের মহিমা বলিতে তাঁহাদের ভাষায় কুলায় না তাঁহারা বলেন,

"লক্ষ রসনায় বলা যদি যায়, তবু না হয় শেষ কথারি "

নাম-সাধনকে প্রকারান্তরে আরাধনাও বলা যাইতে পারে ব্রহ্মস্বরূপের সমগ্র ভাবের যে কীর্ত্তন তাহাই আরাধনা আবার স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপের এক একটির যে স্মরণ ও উচ্চারণ (মনে মনেই হউক আর প্রকাশ্যেই হউক) তাহাই নাম সাধন নাম সাধনের সময় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন নাম করিতে গিয়া নামাপরাধ না হয় উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত, গাঢ় মনোযোগের এবং অর্থানুভবের সহিতই নাম জপাদি করিতে হইবে। তাহা না হইলেই নামাপরাধ হইয়া যাইবে এ বিষয়ে সাধককে সাবধান হইয়াই চলিতে হইবে

ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং নির্জ্জনে উভয় প্রকারেই নামসাধন চলিতে পারে। তবে নির্জ্জনে গাঢ় নিষ্ঠার সহিত, গভীর মনোযোগের সহিত ভক্তিপূর্ণ অন্তরে ধ্যানযুক্ত হইয়া যে নাম জপ, তাহাই সমধিক ফলপ্রদ।

ঈশ্বরের যে নাম সাধকের অতিপ্রিয়—যাহা তাঁহার আন্তরিক ভাবের অনুকূল, সেই নামেই তাঁহাকে ডাকা প্রার্থনীয়, সেই নামেরই জপ করা উচিত। তাহাতেই সাধকের অন্তরে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি সহজে হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ভক্তগণই তাঁহার নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তের সংখ্যা কে করিতে পারে? নামেরই বা সংখ্যা কত কে জানে?

বারম্বার নামসাধন, বারম্বার ঈশ্বর স্মরণ, বারম্বার ঈশ্বরের আরাধনাদির প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা কি? এ প্রশ্নও উপস্থিত হইতে পারে। বারম্বার নাম জপ ও স্মরণাদি দ্বারা সাধকের প্রকৃতিতে সমূহ শুভ পরিবর্ত্তন আসে—সাধুভাবের সমাগম হয়। তাহাতে কল্যাণ গুণ সকলের আবির্ভাব হয়। তাহার প্রকৃতি সুন্দর ও ঈশ্বরভাবাপন্ন হইয়া যায়। যাহার ঈশ্বরের নামজপে তাঁহার নাম ও স্বরূপচিন্তন ও অনুধ্যানে রুচি হইয়াছে, তাহার আশয় উন্নত ও পবিত্র হইয়াছে। সে ঈশ্বর সহবাসের উপযুক্তত লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝা যায়।

তখন তাহার আর অন্য প্রসঙ্গ প্রিয় হয় না। সাধক এ ভাবে সাধন করিতে করিতে

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তি র্মানশূন্যতা
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ

এই বাক্যের বর্ণিত অবস্থা পাইয়া ধন্য হন

উপরোক্ত প্রণালীর সাধন স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক সাধন। এ সাধন সকল দেশে, সকল কালে, সর্ব্বাবস্থাতেই অবলম্বনীয় এবং সহজ। ইহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। ঈশ্বরকৃপায় নির্ভরশীল হইয়া, একান্ত আগ্রহ ও ব্যাকুলতা এবং অনুরাগের সহিত এই সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, সাধকের জীবনে নানা প্রকারের মহা আধ্যাত্মিক সম্পদ্ সমূহ সমাগত হইয়া থাকে। এই উদার ও আধ্যাত্মিক স্বাভাবিক সাধনে অগ্রসর ব্যক্তিতে "ফলভারে অবনত শাখার" শোভা সমাগত হয়—তাঁহার আত্মপ্রীতি ও আত্ম সুখবাসনা-কামনা তিরোহিত হইয়া, তাঁহাতে আত্ম বিস্মৃতি সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রীতি জগতে ব্যাপ্ত হয়। তখন—

"তার প্রেম লাগি' তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি'
তাহাতে, আনন্দলহরী তাহে উঠে অনিবার"

সংগীতের এই বাক্য সার্থক হইতে থাকে

"চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা, জ্ঞানে গভীরত ও প্রেমে বিশালতা" এই সাধুবাক্য তাঁহার জীবনে সফলতা প্রাপ্ত হয় তখন তিনি

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" বাক্যের সার্থকতা জীবনে লাভ করিয়া ব্রহ্মবিৎগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হন তাঁহার জীবন সর্ব্বাংশেই সমুন্নত ও সুন্দর হইয়া কৃতার্থ হয়— সকল সাধুগুণ তাঁহাতে সমাগত হয় পুণ্য প্রেমে মণ্ডিত হইয়া তিনি জগতে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া বাস করেন উপনিষদের—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

বাক্য তাঁহাতে সফলতা লাভ করিয়া, তাঁহাকে কৃতার্থ করে তাঁহার জীবন জন্ম সার্থকতা প্রাপ্ত হয় তিনি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া ব্রহ্মযোগ ভোগ করেন তখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনা নিম্নোক্ত সংগীতের বাক্যে ব্যক্ত হয়

"তোমারি জ্ঞানে, তোমারি ধ্যানে, তব ইচ্ছাপালনে,
হব তন্ময়, ওহে দয়াময় এই ভিক্ষা ও চরণে
তুমি যা বুঝাবে তাহাই বুঝিব, তুমি যা বলিবে তাহাই করিব,
তোমার মহিমা আমার রসনা গাহিবে জীবনমরণে

সুখে দুঃখে শোকে ইহ পরলোকে যখন যেখানে রাখিবে
আমারে,
ভুলি আপনারে, কেবল তোমারে হেরিব যোগনয়নে,
তব আবির্ভাবে জলন্ত প্রভাবে অবিদ্যার অভিমান
ঘুচে যাবে,
দিয়ে বিসর্জ্জন, দেহ প্রাণ মন, পশিব অনন্ত জীবনে।"

এ স্থলেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সমাপ্তি হইল। সর্ব্বশেষে আমরা মহর্ষি মহাশয়ের একটি সংগীতের একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা সাধকের সর্ব্বাবস্থাতেই বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সংগীতের অংশটি এই

"ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্
পাপ নাশ হেতুরেষ নতু বিচার বাহুলম্।"

সত্যমেবজয়তে একমেবাদ্বিতীয়ম্
ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্